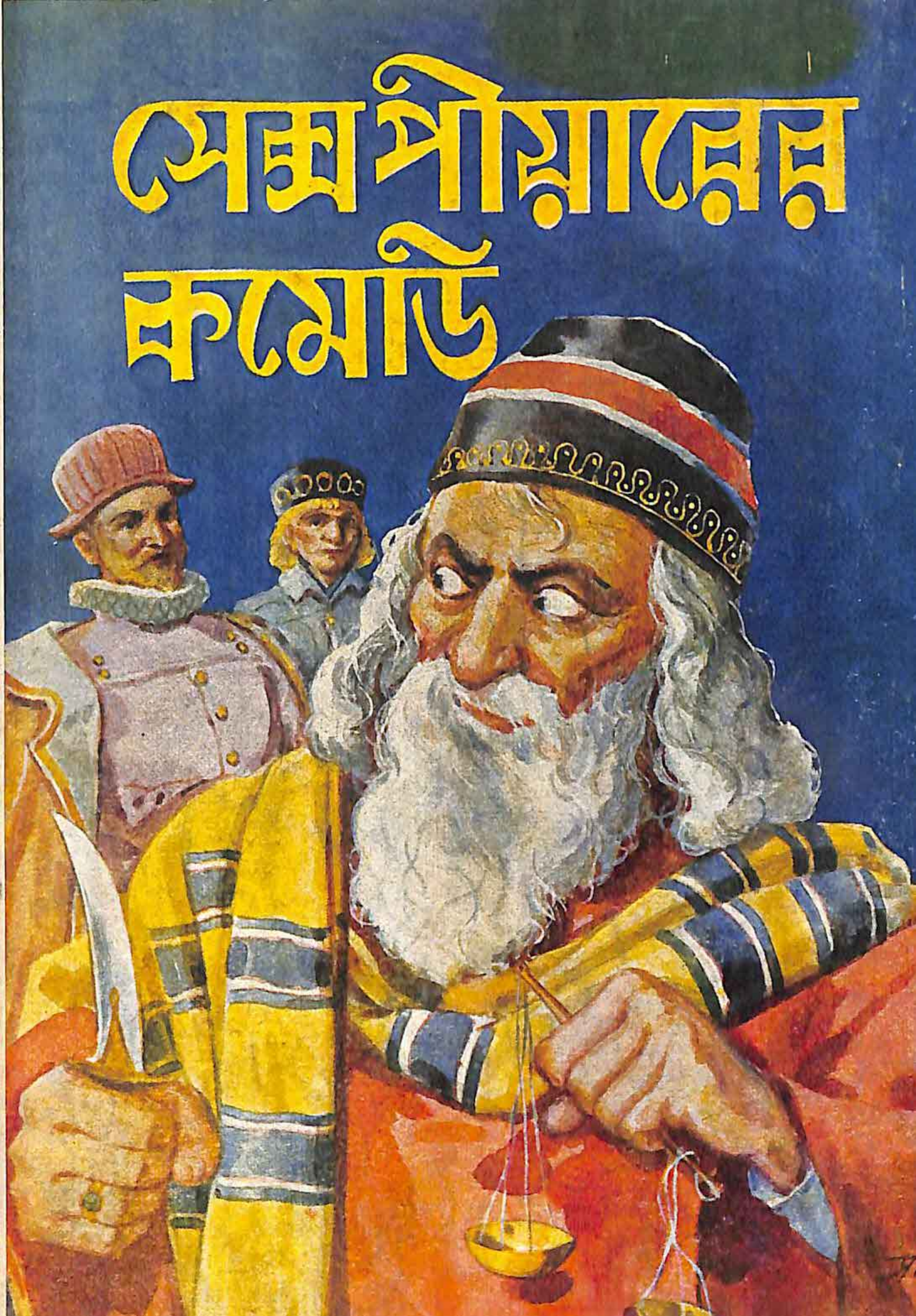

শেক্সপীয়ারের
কমেডি

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক প্রাইজ ও লাইব্রেরীর জন্য অনুমোদিত

অনুবাদ সিরিজ



সেক্সপীয়ারের কমেডি

● উইলিয়াম সেক্সপীয়ার ●

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা
অনূদিত

দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিঃ

প্রকাশ করেছেন—
শ্রীঅরুণচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য-কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড
২১, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা-৯

জুন
১৯৮৫
১৫

ছেপেছেন—
বি. সি. মজুমদার
দেব-প্রেস
২৪, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা—৯

দাম—
টা. ৮·০০



সূচীপত্র

লেখক-পরিচিতি

ইংলণ্ডের ছোট এক নদী, নাম তার আভন। তারই তীরে ছোট শহর স্ট্রাটফোর্ড। আরও ছোট ছিল চারশো বছর আগে। তখন একে শহরই বলত না বড় একটা কেউ।

সেই চারশো বছরের কিছু আগে, ১৫৬৪ খ্রীষ্টাব্দে এই ছোট শহরে উইলিয়াম সেক্সপীয়ারের আবির্ভাব। এঁর মত এমন একটি প্রতিভাধর মানুষ সারা পৃথিবীতেই এ-যাবৎ খুব কমই দেখা গেছে। ইংলণ্ডের সবচেয়ে বড় কবি ও নাট্যকার ত বটেই, এমন কি সারা পৃথিবীর সাহিত্যেও এঁর সমান কবি বা নাট্যকার দু-চারজনের বেশী নেই।

গরিবের ছেলে ছিলেন সেক্সপীয়ার। তবু ছেলেবেলায় তিনি মোটা-মুটি লেখাপড়া করার সুযোগ পেয়েছিলেন। কর্মজীবন তাঁর শুরু হয়েছিল পাঠশালার শিক্ষক হিসাবে। কিন্তু একাজ তাঁকে বেশীদিন ধরে রাখতে পারেনি। তৃপ্তি পাননি এতে। সদাই তাঁর মনে হয়েছে—দেশের মানুষকে দেবার মত জিনিস কিছু আছে তাঁর কাছে। পাঠশালার চৌহদ্দির ভিতর বসে থাকলে সে-জিনিস দেবার সুযোগ তিনি কখনও পাবেন না।

প্রকৃতির ডাক যখন এসে পৌঁছায়, পাখি আর তার ছোট কোটরে বসে থাকতে পারে না। সেক্সপীয়ারও পাঠশালার কোটর থেকে বেরিয়ে লণ্ডনে এসে পড়লেন। কেউ তাঁকে চেনে না এই মহানগরীতে। বাঁচার তাগিদে ঘুরতে ঘুরতে আশ্রয় পেলেন এক আস্তাবলে। আস্তাবলটি ছিল এক রঙ্গালয়ের। সেখানে ঘোড়ার তদারক করতে করতেই তিনি কোন এক সুযোগে অভিনেতার দলে ঠাঁই করে নিলেন!

যত বড় থিয়েটারই হোক, লোকের চাহিদা বুঝে নাটক না লেখালে তা কখনো ব্যবসার দিক্ দিয়ে সুবিধা করতে পারে না। সেক্সপীয়ারের দলেও ফরমাইশী নাটক লেখানো হত। কিছুদিন হালচাল বুঝে নিয়ে তিনিও লিখে ফেললেন একখানা নাটক। এমনি দীনহীনভাবে মহা-নাট্যকারের নাট্যরচনার অভিযান শুরু হল। সকল দেশের সকল যুগের সাহিত্যের আকাশে উদয় হল প্রতিভার এক জ্বলন্ত সূর্য।

বিয়োগান্ত নাটকে আর মিলনান্ত নাটকে সমান দক্ষতা খুব কম

নাট্যকারই দেখাতে পারেন। সেক্সপীয়ার ছুটোতেই অতুলনীয়। নাটক তিনি লিখেছিলেন ত্রিশখানার বেশী। ঐতিহাসিক, সামাজিক, পৌরাণিক কিছুই তিনি বাদ দেননি। সবচেয়ে বড়কথা যখন যে-নাটক লিখেছেন, তাঁর লেখনীর গুণে তাই হয়ে দাঁড়িয়েছে খাঁটি সোনা।

নাটক ছাড়া, অনেকগুলি সনেট কবিতা ও দু-একখানি ছোট কাব্যও তিনি লিখেছেন। মাধুর্যে সেগুলিও অতুলনীয়।

শেষজীবনে রঙ্গালয় থেকে অবসর নিয়ে সেক্সপীয়ার জন্মস্থান স্ট্রাটফোর্ডে গিয়ে বাস করেন। সেখানেই তাঁর তিরোধান হয় ১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দে। প্রতি বৎসর তাঁর জন্মদিনে পৃথিবীর সমস্ত সভ্যদেশের প্রতিনিধিরা সেখানে উপস্থিত হন—তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করবার জন্য।



"পোড়া মাংস! এ অখাদ্য! এ বিষ!" বলতে বলতে সব খাবার ছুঁড়ে ঘরের বাইরে ফেলে দিলেন তিনি।



দি টেমিং অফ দি শ্রু

ইতালী দেশের পদুয়া শহর। সেখানে ব্যাপটিস্টা মিনোলা নামে এক ভদ্রলোক বাস করেন। খুবই ধনী ও মানী লোক তিনি। ছেলে তাঁর নেই, দুটি মাত্র মেয়ে,—ক্যাথারিনা ও বিয়াংকা।

দুই মেয়েই সুন্দরী, বয়সও হয়েছে তাদের। কিন্তু বিয়ে তাদের এখনও হয়নি ; হবে বলে আশাও নেই। বাধা হচ্ছে বড় মেয়ে ক্যাথারিনার বদ স্বভাব। তার মেজাজ বেজায় গরম। যাকে যা খুশি তাই বলে, অনর্থক বকাবকি করে, এমন কি মারধোরও করে। বড় ছোট, ধনী গরিব—কেউই রেহাই পায় না তার কাছে। সমান বয়সের ছেলে-মেয়েদের তো কথাই নেই, বয়সে যারা অনেক বড়, তাদেরও সে ছেড়ে কথা কয় না। এমনকি, তার কাছে বুড়ো বাপেরও কোন খাতির নেই, তাঁকেও সময়ে সময়ে রীতিমত কড়া কথা শুনিয়ে দেয়। এহেন মেয়ের ধারে কাছে কেউ ঘেঁষতে চায় না।

এমন মেয়ের বিয়ে কি করে হবে? পদুয়া শহর তো বটেই, এমন কি আশেপাশের সকল শহর ও গ্রামের সব যুবকই ক্যাথারিনার বদ স্বভাবের কথা জেনে ফেলেছে। বিয়ের গরজ যার যতই থাক, কেউ আর ব্যাপটিস্টার বাড়িমুখেও হয় না ক্যাথারিনার ভয়ে।

তবে বিয়াংকাকে বিয়ে করতে অনেকেই চায়। সে সুন্দরী তো বটেই, স্বভাবও তার খুবই মিষ্টি। কিন্তু ব্যাপটিস্টা নিজের মনের কথা সকলকেই

খুলে বলেছেন। বড়মেয়ে ক্যাথারিনার বিয়ে আগে না হলে ছোট মেয়ে বিয়াংকার বিয়ে তিনি কোনমতেই দেবেন না।

গ্রেমিও আর হর্টেনসিও তুজনেই যুবক ও বেশ ধনী। এদের তুজনের বাড়ি পতুয়াতেই। এরা তুজনেই বিয়াংকাকে বিয়ে করতে চায়। তাই তুজনের মধ্যে রেষারেষি যথেষ্ট। কিন্তু একদিন পথের মধ্যে দেখা হতেই ব্যাপটিস্টা তুজনকেই হাঁকিয়ে দিলেন, স্পষ্টই বললেন, "বিয়ে যদি করতে চাও তো আমার বড় মেয়ের দিকে মন দাও, নয় তো তার একজন স্বামী খুঁজে বার করে দিয়ে তবে ছোট মেয়ে বিয়াংকার বিয়ের কথা বলতে এসো।" এই বলে তিনি ক্যাথারিনার দিকে সস্নেহ দৃষ্টিতে তাকালেন, আর বিয়াংকা মাথা নীচু করে রইল। ছোট বোনকে বিয়ে করার তুজন উমেদার দেখে ক্যাথারিনা তুচারটে কড়া কথা শোনাল। বিয়াংকা এবার কথা না কয়ে পারল না। সে বলল যে সে এখন বিয়ে করবে না, বরং বাড়িতে বসে লেখাপড়া ও গানবাজনা নিয়ে সময় কাটাবে। ব্যাপটিস্টা তখন জানালেন যে তিনি বিয়াংকার জন্য শিক্ষক রাখবেন, আর গ্রেমিও ও হর্টেনসিও ইচ্ছা করলে একজন উপযুক্ত শিক্ষক পাঠিয়ে দিতে পারে।

এরকম সরাসরি প্রত্যাখ্যানের পর গ্রেমিও ও হর্টেনসিও নিজেদের রেষারেষি মুলতুবি রেখে বন্ধুভাবে পরামর্শ করতে বসল। হর্টেনসিও ক্যাথারিনার একজন স্বামী খুঁজে বার করে দেবার প্রস্তাব করল। এতে গ্রেমিও প্রথমে আপত্তি করলেও শেষ পর্যন্ত একথায় সায় না দিয়ে পারল না। ঠিক হল, ক্যাথারিনার স্বামী খুঁজে দেবার পর তুজনে আবার আগের মত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিয়াংকাকে পাবার চেষ্টা করবে।

ঠিক এই সময় ট্রানিও নামে এক ভৃত্যকে সঙ্গে নিয়ে লুসেন্সিও নামে এক ধনী অবিবাহিত যুবক ওই পথ দিয়ে যাচ্ছিল। সে বিয়াংকাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে ওখানে থমকে দাঁড়িয়েছিল, আর সব কথাবার্তা শুনছিল। সে ভাবল যে বিয়ে যদি তাকে করতেই হয় তো বিয়াংকার মত মেয়েকেই বিয়ে করতে হবে। সে ঠিক করল যে সে শিক্ষক সেজে বিয়াংকার শিক্ষার ভার নেবে, নইলে ওখানে পাত্তা পাওয়াই মুশকিল হবে।

লুসেনসিওর বাড়ি হচ্ছে পতুয়া শহর থেকে অনেক দূরে পিসা নগরে। তার পিতা ভিনসেনসিও একজন ধনী ব্যবসায়ী। তিনি কতকগুলি আদায় পত্রের ভার দিয়ে তাকে নিজের পতুয়ার আড়তে পাঠিয়েছেন।

লুসেন্সিও তার ভৃত্য ট্র্যানিওকে নিজের মনের কথা জানিয়ে বলল,

কিভাবে ব্যাপটিস্টার অন্দরমহলে ঢুকে বিয়াংকার শিক্ষক সেজে সে তাকে বিয়ে করবার চেষ্টা করবে। তারপর ভৃত্যকে সে বলল, "তুই আমার দামী পোশাকটা পরে লুসেনসিও সেজে আমাদের পত্নয়ার আড়তে বসে ব্যবসার টাকাকড়ি আদায় করতে থাক্, আর ব্যাপটিস্টার সঙ্গে সামাজিকভাবে দেখা করে বিয়াংকাকে বিয়ে করার প্রস্তাবটাও করে রাখ্। আর আমি ওদিকে শিক্ষক সেজে বিয়াংকার মন পাবার চেষ্টা করতে থাকি। দুদিক থেকেই তোড়জোড় করা যাক্, দেখি শেষ পর্যন্ত কী দাঁড়ায়!"

মনিবের কথা অমান্য করার সাহস ট্র্যানিওর নেই। তাই সে দামী পোশাক পরে লুসেনসিও সেজে গিয়ে বসল ভিনসেনসিওর পত্নয়ার আড়তে, আর আসল লুসেনসিও তখন ক্যাম্বিও নাম নিয়ে একজন গরিব শিক্ষক সেজে ব্যাপটিস্টার অন্দরমহলে ঢুকে পড়বার চেষ্টা করল। বিয়াংকাকে সে পড়াবে সাহিত্য।

* * *

নিজের বাড়ি ফিরে আসতেই হর্টেনসিও দেখে—দোরগোড়াতে দারুণ হৈ-হল্লা চলছে। একজন ভদ্রলোক নির্দয়ভাবে মারপিট করে যাচ্ছেন তাঁর ভৃত্যের উপরে। এগিয়ে যেতেই হর্টেনসিও দেখল, ভদ্রলোকটি তার পুরোনো বন্ধু পেত্রুশিও। বাড়ি তাঁর ভেরোনা শহরে। পত্নয়ায় হঠাৎই আগমন হয়েছে তাঁর, এবং এসেই নিজের ভৃত্য গ্রুমিওর উপরে ভীষণ রেগে উঠেছেন তুচ্ছ কারণে।

বেচারা ভৃত্যকে তার মনিবের হাত থেকে উদ্ধার করে হর্টেনসিও বন্ধুর খবরাখবর জিজ্ঞাসা করতে লাগল। পেত্রুশিও জানালেন—তাঁর খবর খুবই ভাল। ধনী পিতা অল্পদিন হল মারা গেছেন। তাঁকে দিয়ে গেছেন অনেক টাকাকড়ি, প্রকাণ্ড বাড়ি, মস্তবড় বাগান, খেতখামার, দাসদাসী গাড়িঘোড়া—কোন কিছুরই অভাব আজ তাঁর নেই। বিয়ে এখনও তিনি করেননি। ভেরোনা শহরের ধনী মানী লোকেরা আজ তাঁর নাম জানে।

মনের আনন্দে তিনি এখন দেশভ্রমণে বেরিয়েছেন। জগৎসংসারকে ভাল করে চেনবার ও দেখবার তাঁর ইচ্ছা, আর সুযোগ পেলে একটা মনের মত বউ যোগাড় করে নেবেন। পত্নয়ার হর্টেনসিও তাঁর বহুদিনের বন্ধু। তাই প্রথমেই এসেছেন তাঁরই বাড়িতে।

পেত্রুশিওর সব কথা শোনার পর হর্টেনসিও হাসতে হাসতে বলল যে তার বন্ধু যে রকম রাগী, তাতে তাঁর একটা ঝগড়াটে বউ হলেই মানায়

বেশ! অবশ্য হর্টেনসিও সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলল যে সেই বউটা যেন খুব ধনী বাপের আদুরে মেয়ে হয়।

টাকার উপর পেক্রশিওর প্রচণ্ড লোভ। নিজের বাপের কাছ থেকে পেয়েছেন অনেক, তবুও আরও অনেক পেলে যেন তাঁর ভাল হয়! তাই হর্টেনসিওর কথার জবাবে তিনি বললেন যে ধনী ঝগড়াটে পাত্রী পেলে বিয়ে করতে তিনি মোটেই অরাজী নন। পেক্রশিওর মনের কথাটা জানতে পেরে হর্টেনসিও তখনই ক্যাথারিনার কথা পেড়ে বসল। তাঁকে সে ব্যাপটিস্টা মিনোলার সব কথাই খুলে বলল, এমন কি বিয়াংকার সঙ্গে তার নিজের অসফল প্রণয়ের কথাটাও।

হর্টেনসিওর সব কথা মন দিয়ে শুনে পেক্রশিও বললেন, "ঠিক আছে, ঐ দজ্জাল মেয়েকেই আমি বিয়ে করব। চল, এখনই ব্যাপটিস্টার সঙ্গে দেখা করে বিয়ের কথাটা পাকাপাকি করে আসি। যদি ভাল রকমের যৌতুক পাই, তবে ক্যাথারিনার ভার আমিই নেব। আমি জানি, ঐ ধরনের মেয়েকে কি করে ঢিট করতে হয়।"

বন্ধুকে এত তাড়াতাড়ি ব্যাপটিস্টার কাছে যেতে দেখে হর্টেনসিও বলে বসল, "বন্ধু! তুমিও আমার একটা উপকার কর। জানই তো, বিয়াংকাকে আমি বিয়ে করতে চাই, কিন্তু তার প্রেমের দাবিদার আছে আমার এক বন্ধু। তাই শেষ অবধি কি হবে, তার মোটেই ভরসা নেই। তবে আমি যদি কোন রকমে অন্দরমহলে ঢুকে বিয়াংকার সঙ্গে মাঝে মাঝে আলাপ করবার সুযোগ পাই, তার মনটা আমার দিকে ঝুঁকবে, আর তাকে আমার বিয়ে করাটাও সহজ হবে। কিন্তু মুশকিল তার ওই বুড়ো বাপটাকে নিয়ে। সে বুড়োটা আমাকে চেনে, তাই আমাকে কিছুতেই অন্দরমহলে ঢুকতে দেবে না। ভাবছি, শিক্ষক সেজে ছদ্মবেশে তার চোখকে ফাঁকি দিয়ে অন্দরমহলে ঢুকব। তুমি তো ক্যাথারিনাকে বিয়ে করার প্রস্তাব নিয়ে ব্যাপটিস্টার কাছে যাচ্ছ, তাই তুমি যদি সেই সময় আমাকে শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত করার কথা ব্যাপটিস্টাকে বল তো ব্যাপটিস্টা তোমার কথা ঠেলতে পারবে না।"

পেক্রশিও এতে রাজী হয়ে গেল। দুজনে তখন ব্যাপটিস্টার বাড়ির দিকে রওনা হল।

পথে যেতে যেতে তাদের সঙ্গে গ্রেমিও ও ছদ্মবেশী লুসেনসিওর দেখা হল। কিছু আগে লুসেনসিও রাস্তায় গ্রেমিওকে পাকড়াও করে তাকে

গৃহশিক্ষকের কাজ খুঁজে দেবার কথা বলেছে। গ্রেমিও তাই তাকে ব্যাপটিস্টার কাছে নিয়ে যাচ্ছে, আর তাকে বোঝাচ্ছে, বিয়াংকাকে কি কি প্রেমের পাঠ পড়াতে হবে যাতে সে গ্রেমিওর দিকে প্রসন্ন দৃষ্টি দেয়।

হঠাৎ হর্টেনসিওকে দেখতে পেয়ে গ্রেমিও উচ্ছ্বসিত হয়ে জানাল যে বিয়াংকাকে কাব্য পড়াবার জন্য সে একজন শিক্ষককে নিয়ে ব্যাপটিস্টার বাড়ির দিকে যাচ্ছে। হর্টেনসিও বলল যে সেও ক্যাথারিনার একজন হবু স্বামীকে নিয়ে সেখানেই যাচ্ছে।

তারা চারজন মিলে তখন ব্যাপটিস্টার বাড়ির দিকে এগিয়ে গেল।

ব্যাপটিস্টার বাড়ির কাছে এসে লুসেনসিও দেখল যে তার ভৃত্য ট্র্যানিও দামী পোশাক পরে ব্যাপটিস্টার বাড়ির দরজায় হাজির, তার পেছনে রয়েছে লুসেনসিওর আর এক ভৃত্য, নাম বায়েনডেলো। ভৃত্যের এক হাতে একটা বেহালা, আর অন্য হাতে কতকগুলো বই। আগে থেকেই বায়েনডেলোকে সব কিছুই জানিয়ে রাখা হয়েছিল, নইলে গরিব শিক্ষক সাজলেও আসল লুসেনসিওকে সে সম্ভাষণ করে বসত। সে এমন ভাব দেখাল যেন লুসেনসিওবেশী ট্র্যানিওই তার মনিব।

ট্র্যানিওর দামী পোশাক ও চালচলন দেখে গ্রেমিও আর হর্টেনসিও বুঝতে পারল যে আর একজন বিয়ের উমেদার এসে জুটেছে। আলাপ হতেই ট্র্যানিও স্পষ্টই তাদের জানিয়ে দিল যে সে পিসা নগরের একজন ধনী ব্যবসায়ীর পুত্র লুসেনসিও—বিয়াংকার রূপ ও গুণের কথা শুনে নিজের বিয়ের সম্বন্ধ করতে সে এসেছে।

ব্যাপটিস্টার বাড়িতে ঢুকতেই তিনি সকলকে স্বাগত জানালেন।

পেত্রুশিও প্রথমেই নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন যে তিনি ক্যাথারিনাকে বিয়ে করতে চান, আর সেই ইচ্ছার প্রতিদানে তার শিক্ষার জন্য মণ্টুয়ার অধিবাসী লিসিয়া নামে একজন খ্যাতিমান্ সংগীতজ্ঞ ও গণিত-বিদ্যাবিশারদকেও উপহার দিচ্ছেন। এই বলে তিনি ছদ্মবেশী হর্টেনসিওকে দেখিয়ে দিলেন।

* * *

ব্যাপটিস্টা যেন নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারেন না। পেত্রুশিওর পিতাকে তিনি চিনতেন। ভেরোনা শহরের মস্ত একজন ধনী ছিলেন তিনি। তাঁর একমাত্র ছেলে এসে তাঁর বদমেজাজী বড়মেয়ে ক্যাথারিনাকে বিয়ে করতে চাইবেন, এ যে তিনি স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি! খুশী হয়ে

তিনি ছদ্মবেশী হর্টেনসিওকে ক্যাথারিনার শিক্ষক হিসাবে গ্রহণ করলেন।

সঙ্গে সঙ্গে গ্রেমিও ব্যাপটিস্টাকে বলল যে বিয়াংকাকে সাহিত্য ও কাব্য পড়াবার জন্য সেও একজন শিক্ষককে নিয়ে এসেছে। এই বলে সে ছদ্মবেশী লুসেনসিওকে দেখিয়ে বলল যে এঁর নাম ক্যাম্বিও আর ইনি এখন রীম্‌স্ বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করছেন এবং গ্রীক, ল্যাটিন ও অন্যান্য ভাষায় প্রগাঢ় পণ্ডিত। এরকম পাণ্ডিত্যের বহর শুনে ছদ্মবেশী লুসেনসিওকে বিয়াংকার শিক্ষক হিসাবে গ্রহণ করতে ব্যাপটিস্টা মোটেই আপত্তি করলেন না, বিশেষ করে বড় মেয়ে ক্যাথারিনাকে বিয়ে করার মত একটা সুপাত্র হাতে এসেছে বলে তাঁর মন তখন খুশীতে ভরা।

এরপর ট্র্যানিও নিজেকে লুসেন্‌সিও বলে পরিচয় দিয়ে বিয়াংকাকে বিয়ে করার প্রস্তাব পেশ করল, আর সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের শিক্ষার সুবিধার জন্য বেহালাটি ও পুস্তকগুলি উপহার দিল। ব্যাপটিস্টা তখন আনন্দে এত আত্মহারা ছিলেন যে উপহারগুলি তিনি গ্রহণ করে বসলেন এবং ছদ্মবেশী হর্টেনসিওকে বেহালাটি দিয়ে অন্দরমহলে ক্যাথারিনার কাছে পাঠিয়ে দিলেন তাকে গান শেখাবার জন্য। তারপর ছদ্মবেশী লুসেনসিওর হাতে পুস্তকগুলি দিয়ে তিনি তাকে বিয়াংকার কাছে পাঠালেন সাহিত্য ও কাব্য পড়াবার জন্য।

উদ্দেশ্য সিদ্ধি হয়েছে বুঝতে পেরে ট্র্যানিও এবার উঠে পড়ল। তার ভয়—বেশী কথা বললে যদি মতলবটা বেফাঁস হয়ে যায়, বিশেষতঃ পেত্রুশিওর কাছে। ট্র্যানিও তার ভৃত্য বায়েনডেলোকে নিয়ে চলে গেলে ব্যাপটিস্টা নিশ্চিন্তমনে পেত্রুশিওর সঙ্গে কথা কইতে বসলেন।

কিন্তু কথা কইবেন কী? ছদ্মবেশী হর্টেনসিও বাড়ির অন্দর থেকে দৌড়তে দৌড়তে সেখানে এসে হাজির। তার মাথায় আঘাতের চিহ্ন। সে হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, "বাপ্ কি সাংঘাতিক মেয়ে আপনার! আমার মাথাটা একেবারে গুঁড়িয়ে দিলে।"

ব্যাপটিস্টা উত্তেজিত হয়ে বললেন, "কি হল? কি হল?"

হর্টেনসিও বলল, "মশাই, আপনার বড় মেয়ে যে একজন সেপাই তা তো জানতাম না। দেখুন না, আমার মাথার কি হাল করেছে।" এই বলে সে তার ভাঙ্গা মাথাটা ঝুঁকিয়ে দেখাতে লাগল।

ব্যাপটিস্টা বললেন, "কিন্তু এরকম হল কি করে, আর কেনই বা হল?"

হার্টেনসিও বলল, "বেহালা দিয়ে আমার মাথাকে পিটিয়েছে। উঃ! সে কি মার!"

পেত্রুশিও জিজ্ঞাসা করল, "মারল কেন? আপনি কি করেছিলেন?"

হর্টেনসিও বলল, "বেহালা বাজাতে গিয়ে ক্যাথারিনা প্রায়ই ভুল করছিল, তাই তার হাতের আঙুলটা ধরে যেই শিখিয়ে দিতে গেছি, সে রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে বেহালাটা দিয়ে আমার মাথায়…।"

"থাক্, থাক্, আর বলতে হবে না।" বলেই পেত্রুশিও হর্টেনসিওকে থামিয়ে দিল।

ব্যাপটিস্টা ক্যাথারিনার এই আচরণে ক্ষুব্ধ ও লজ্জিত হয়ে মাথা নীচু করে সব শুনছিলেন। তিনি তো জানেন, তাঁর বড়মেয়ের বদ স্বভাবের কথা। তাঁর আক্ষেপ, এতদিনে যদিও বা তাকে বিয়ে করার জন্য একজন ধনী মানী পাত্র নিজে যেচে তাঁর কাছে প্রস্তাব নিয়ে এসেছে, এবার এসব দেখে শুনে না পিছিয়ে পড়ে! তাই তিনি তাড়াতাড়ি এই অস্বস্তিকর আবহাওয়া এড়াবার জন্য ছদ্মবেশী হর্টেনসিওকে বললেন, "তাহলে আপনি আমার ছোট মেয়েকেই গানবাজনা শেখান।" ব্যাপটিস্টা একথা বলামাত্রই হর্টেনসিও কিছুমাত্র দেরি না করে ভাঙ্গা বেহালাটা বগলে নিয়ে অন্দরমহলে ফিরে গেল, যেখানে বিয়াংকাকে কাব্য পড়াচ্ছে ছদ্মবেশী লুসেনসিও।

ব্যাপটিস্টা এবার পেত্রুশিওর কাছে বড় মেয়ের অন্যায় আচরণের জন্য দুঃখ প্রকাশ করতে লাগলেন। পেত্রুশিও অবশ্য ব্যাপারটাকে লঘু করে দেবার চেষ্টা করলেন, আর ঐ বদমেজাজী মেয়ের সাথে তাঁর বিয়েটা তাড়াতাড়ি সেরে ফেলবার পরামর্শ দিলেন।

ব্যাপটিস্টা কি করবেন, ভেবে পাচ্ছেন না। কিন্তু পেত্রুশিও দমবার পাত্র নন। শেষ পর্যন্ত যৌতুক হিসাবে বিশহাজার মোহর নগদ পাওয়ার প্রতিশ্রুতি আদায় করে, আর বিয়ের দিনটা ঠিক করে পেত্রুশিও ফিরে গেলেন।

ব্যাপটিস্টাকে তিনি জানিয়ে এলেন যে তিনি বিয়ের পোশাক কেনবার জন্য ভেনিস শহরে যাচ্ছেন, সেখান থেকে বিয়ের দিনে যথাসময়েই ফিরে এসে ক্যাথারিনাকে বিয়ে করবেন।

চলে আসার আগে অবশ্য ক্যাথারিনার সঙ্গেও দেখা করলেন পেত্রুশিও। ক্যাথারিনার মেজাজ তখন সপ্তমে চড়ে আছে। সে পেত্রুশিওকে গানের

মাস্টারের দালাল বলে সন্দেহ করেছে, তাই তাঁকে যা মুখে আসে তাই বলে গালাগাল দিতে লাগল, এমন কি শেষ পর্যন্ত তাঁকে দু-এক ঘা বসিয়েও দিল। পেক্রুশিও হাসিমুখে সব সহ্য করে 'আগামী রবিবার তোমায় বিয়ে করতে আসছি' বলে বিদায় নিল। চলে যাবার সময় ক্যাথারিনা বলল, "আমার সঙ্গে বিয়ে হলে তোমার হাড়মাস কালি করে দেব, তখন বুঝতে পারবে, আমাকে বিয়ে করার কি মজা!"

* * *

বিয়াংকাকে শেখাবার ব্যাপারে রেষারেষি চলল লুসেনসিও আর হর্টেনসিওর ভিতরে। হর্টেনসিও বাজাবার যন্তরটাতে তার বাঁধছে, ততক্ষণ কবিতার বই খুলে বসেছে লুসেনসিও। পড়াচ্ছে—

"হিক্ ইবার্ট সিমোয়েস্, হিক্ এস্ট্ সিগিয়া টেলাস্,
"হিক্ এস্টেটিরাট্ প্রায়ামি, রিজিয়া সেল্সা সেনিস্।"

বিয়াংকা জিজ্ঞাসা করে, "গুরুমশাই, এর মানেটা কী হল?"

লুসেনসিও বলে, "মানে? শোন তবে এ লাইনগুলোর মানে! 'হিক্ ইবাট্ সিমোয়েস্'-এর মানে হল—আমার নাম লুসেনসিও। 'হিক্ এস্ট্'-এর পিসানগরের ভিনসেনসিওর ছেলে। 'সিগিয়া টেলাস্'-এর মানে হল—তোমাকে বিয়ে করবার আশাতেই এই গুরুমশাই সাজা। 'হিক এস্টেটিরাট্'-এর মানে—সেই যে লোকটি তোমার বাবার কাছে এসে লুসেনসিও বলে নিজের পরিচয় দেয়—'প্রায়ামি'—অর্থাৎ সে আমার ভৃত্য ট্র্যানিও। 'রিজিয়া।'—অর্থাৎ আমাদের এখানকার আড়তে বসে আমার নামে পরিচয় দিয়ে আমার সব কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে। 'সেল্সা সেনিস্'-এর মানে কি জান?—এর মানে হল—তোমার বুড়ো বাপকে ধাপ্পা দেওয়ার জন্য এইসব কাণ্ড করতে হয়েছে।"

মূল কবিতার অংশগুলিকে জোর গলায়, আর টুকরো টুকরো মানেগুলিকে নীচুগলায় বলে চমৎকার পড়িয়ে যাচ্ছিল লুসেনসিও। এমন সময় ওদিক থেকে হর্টেনসিও হাঁকল, "আমার তার বাঁধা হয়ে গেছে, এবার আমি বাজনা শেখাব।"

বিয়াংকা বলে উঠল, "কেমন বাঁধা হয়েছে, বাজান দেখি।"

হর্টেনসিও বাজায়।

বিয়াংকা বলে ওঠে, "না না, তার বাঁধা মোটেই হয়নি। কোমলে ...ং কিড়িং করছে।"

লুসেনসিও বলল, "এবার তুমি মানে বল,। দেখি কেমন বুঝতে পেরেছ।"

বিয়াংকা ব্যাখ্যা করে বলল, 'হিক্ ইবাট সিমোয়েস্'—আমি তোমায় চিনি না। 'হিক্ এস্ট সিগিয়া টেলার্স'—আমি তোমায় বিশ্বাস করি না। 'হিক্ এস্টেটিরাট প্রায়ামি'—সাবধান যেন গানের ওস্তাদ কিছু শুনতে না পায়। 'রিজিয়া'—বেশী আশা কোরো না। 'সেল্সা সেনিস্'—হতাশও হয়ো না।

আবার হর্টেনসিও হেঁকে উঠল, "এবার ঠিক তার বাঁধা হয়েছে।"

বিয়াংকা জবাব দিল, "ছাই হয়েছে। এবারে কড়িতে বেসুরো বাজছে।"

যাই হোক্ হর্টেনসিওকে একটা সুযোগ দিতেই হবে গান শেখাবার, তাই বিয়াংকা তার দিকে ঘুরে বসল। প্রথমেই একটা কাগজ তার হাতে দিয়ে হর্টেনসিও বলল, "স্বরলিপিটা একবার দেখে নাও।"

বিয়াংকা পড়তে লাগল—সারে গামা পাধা নিসা। হর্টেনসিও সুরের মানে বোঝাতে লাগল।

সা রে গা—এর মানে 'বেচারা হর্টেনসিও তোমার জন্য পাগল!'

রে গা মা—এর মানে, 'তাকে তোমায় বিয়ে করতে হবে!'

গা মা পা—এর মানে, 'সে তোমায় প্রাণ দিয়ে ভালবাসে!'

পা ধা নি—এর মানে, 'আমার একটা প্রার্থনা আছে!'

ধা নি সা—এর মানে, 'দয়া কর, তা নইলে আমি মারা পড়ব!' এরকমভাবেই বিয়াংকাকে শিখিয়ে যায় লুসেনসিও আর হর্টেনসিও।

* * *

যেভাবেই হোক—ক্যাথারিনার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। কাজেই বিয়াংকার বিয়ের কথা আলোচনা করতে ব্যাপটিস্টার এখন আর আপত্তি নেই। বিয়াংকাকে বিয়ে করতে চাইছে গ্রেমিও, হর্টেনসিও এবং লুসেনসিও। অবশ্য লুসেনসিও নামে যে লোকটি বিয়াংকার জন্য ঘোরাফেরা করছে, সে আসলে সেই ট্র্যানিও ছাড়া আর কেউ নয়। আসল লুসেনসিও তখনও অন্দরমহলে সাহিত্যের পুঁথি বগলে নিয়ে বিয়াংকার আশেপাশে ঘুরছে।

এ-অবস্থায় পাত্র বাছাই করে নেওয়া যে কোন অভিভাবকের পক্ষেই কঠিন কাজ; কিন্তু ব্যাপটিস্টা ও-ব্যাপারটাকে জলবৎ তরল করে

ফেললেন। তাঁর কথা হল—আমি তো মেয়ের বিয়েতে বিশ হাজার মোহর যৌতুক দিচ্ছি। পাত্রেরা কে কত যৌতুক দিতে চান স্ত্রীকে? পাত্রদের মৃত্যু যদি আগে হয়, তাহলেই বা বিয়াংকা কী পরিমাণ সম্পত্তি লাভ করবে? সেটি তিনি জানতে চাইলেন সকলের সামনে। সকলকে স্পষ্টই জানিয়ে দিলেন—যার যৌতুক সবচেয়ে বেশী হবে তার সাথেই বিয়াংকার বিয়ে দেবেন।

গ্রেমিওর চেয়ে হর্টেনসিওর টাকাকড়ি বেশী, কাজেই গ্রেমিও প্রথমেই সরে দাঁড়ালেন। বাকী রইল—হর্টেনসিও আর লুসেনসিও। হর্টেনসিওর চেয়ে লুসেনসিও বেশী ধনী, কিন্তু লুসেনসিওর পিতা ভিনসেনসিও এখনো জীবিত, এবং তাঁর সম্পত্তি সবই রয়েছে বহুদূরে—পিসা নগরীতে। কাজেই ব্যাপটিস্টা বললেন, "লুসেনসিওর সাথে আমি মেয়ের বিয়ে দিতে রাজী আছি, যদি তার পিতা এখানে এসে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি লুসেনসিওকে, এবং তার অবর্তমানে আমার মেয়েকে দিতে রাজী হন।"

ব্যাপটিস্টার এই সিদ্ধান্তে হর্টেনসিও ক্ষুব্ধ হয়ে ঠিক করল যে সে এবার বিয়াংকার আশা ছেড়ে দিয়ে তার পরিচিত একজন বিধবা মহিলাকে দুচার দিনের মধ্যেই বিয়ে করে ফেলবে, বিশেষতঃ এত চেষ্টা করেও বিয়াংকা যখন তার মোটেই অনুরাগী হল না।

লুসেনসিওর পক্ষ থেকে কথাবার্তা চালাচ্ছিল অবশ্য তার ভৃত্য ট্র্যানিও। মনিবের দামী পোশাক পরে ও তার নাম নিয়ে সে ব্যাপটিস্টার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে বিয়াংকাকে বিয়ে করবে বলে। ভৃত্যের বুদ্ধি আর কত হবে? সে লুসেনসিওকে কিছু জিজ্ঞাসা না করেই নিজের বুদ্ধিতে এগিয়ে চলল। নিজে যেমন জাল-লুসেনসিও সেজেছে, ঠিক সেভাবেই একজনকে জাল-ভিনসেনসিও সাজিয়ে নিয়ে এল ব্যাপটিস্টার কাছে। মতলব এই যে জাল-ভিনসেনসিওকে সামনে খাড়া রেখেই সে মনিবের কাজটা হসিল করবে।

* * *

এদিকে পেত্রুশিও ক্যাথারিনাকে বিয়ে করবার দিন ঠিক করে রেখেই উধাও হয়েছেন। বলে গেছেন, "আমি আগামী রবিবার আসব। বিয়ের ব্যবস্থা সব যোগাড় থাকে যেন। আমি এসেই সোজা গির্জায় চলে যাব।"

রবিবার এল, সবাই সেজেগুজে তৈরী হলেন, পেত্রুশিও এলেই সকলে

মিলে গীর্জার দিকে রওনা হবেন। কিন্তু কই পেত্রুশিও? তাঁর আর দেখা নেই!

বেলা বাড়তে লাগল। বিয়ে দেবার জন্য পুরোহিত তৈরী হয়ে এসেছেন, তিনিও অস্থির হয়ে উঠলেন। ব্যাপটিস্টার ভয় হতে লাগল। নেমন্তন্ন পেয়ে যাঁরা বিয়ে দেখতে এসেছেন, তাঁরা পরিহাস করতে শুরু করলেন। তাতে ক্যাথারিনা কেঁদে ফেলল রাগে ও দুঃখে। অবশেষে সবাই যখন প্রায় আশা ছেড়ে দিয়েছে, তখন পেত্রুশিও এলেন। সঙ্গে বন্ধু নেই, আত্মীয় নেই, একটি মাত্র ভৃত্য নিয়ে তিনি এলেন এক বুড়ো ঘোড়ায় চড়ে। রাস্তার ভিখারীরা যেমন নানা-রঙের তালি দেওয়া জামা পরে, সেই রকম একটা জামা তাঁর গায়ে। দু-পায়ে দু-রকমের দু-খানা জুতো, একটা ফিতে-বাঁধা, আর একটা বকলস আঁটা।

পেত্রুশিওর চেহারা দেখে কারও মুখে আর রা নেই। ক্যাথারিনা তো রেগে আগুন! কখনো কাঁদে, কখনো চেঁচামেচি করে, কড়া কথায় কখনো গালি দেয় পেত্রুশিওকে।

পেত্রুশিওর এক জবাব, "তুমি বিয়ে করবে কি আমাকে, না, আমার পোশাককে? বিয়েটা হয়ে যাক, কাপড় কিনতে কতক্ষণ?"

অন্য সবাইও সেই মতেই মত দিতে বাধ্য হল শেষ পর্যন্ত। বিয়ের সবই যখন ঠিকঠাক, তখন সেটা না হলে বড়ই লজ্জার কথা হবে সমাজে। তাই বিয়েটা শেষ পর্যন্ত হয়েই গেল। তারপর বিয়ের ভোজ। বহুলোককে নেমন্তন্ন করেছেন ব্যাপটিস্টা।

কিন্তু পেত্রুশিও বলে বসলেন, "আমার পক্ষে এখন ভোজ খেতে বসা অসম্ভব; বাড়িতে আমার ভয়ানক জরুরী কাজ আছে। আমি এখনই ফিরে যাব।"

বিয়ের পরে বর-কনেকে নিয়েই অতিথিরা ভোজ খেতে বসেন। সেটাই দেশাচার। বরই যদি চলে যায়, তবে আর ভোজের মূল্য কী রইল?

কিন্তু পেত্রুশিও ফিরে যাবেনই। শুধু একাই যাবেন না, নিয়ে যাবেন নতুন বউকেও। বিয়ের পরে একা একা বাড়ি ফিরবেন না তিনি।

একথায় ক্যাথারিনা একেবারে বেঁকে বসল! "যাব না, নিজের বিয়ের ভোজ না খেয়ে!"—ধনুকভাঙ্গা পণ তার।

কিন্তু এ পণও তার ভাঙতে হল। সবাই বোঝাল তাকে, "এখন যদি

স্বামীর সঙ্গে না যাও, দুর্নাম হবে তোমার। দেশের লোক দোষ দেবে তোমারই।"

ক্যাথারিনা আর কি করে! তার বাবা বলছেন, সকলেই বলছেন তার স্বামীর সাথে যাবার জন্য। অগত্যা বাধ্য হয়ে স্বামীর সঙ্গে চলে যেতেই হল তাকে—বিয়ের ভোজ না খেয়েই। সারা পথ ঘোড়ায় চলল দুজনে। একে তো ঘোড়ায় চড়া ক্যাথারিনার তেমন অভ্যাস নেই, তার ওপর পেত্রুশিও পিছন থেকে এমন তাড়া দিলেন ক্যাথারিনার ঘোড়াকে যে সেই ঘোড়া ক্যাথারিনাকে মাটিতে কাদায় ফেলে দিয়ে দৌড়ে পালিয়ে গেল। তখন ক্যাথারিনাকে নিজের ঘোড়ায় তুলে পিছনে বসিয়ে নিলেন পেত্রুশিও।

কাদা-মাখা কাপড়চোপড় পরে, স্বামীর পিছনে ঝুলতে ঝুলতে স্বামীর বাড়িতে প্রবেশ করল ক্যাথারিনা। অপমানে মাথা হেঁট হয়ে পড়েছে তার। অত যে দাপট তার, সব ধুলোয় মিশে গিয়েছে এরই মধ্যে।

বাড়ি পৌঁছেই চাকরদের উপর ভীষণ চোটপাট শুরু করলেন পেত্রুশিও। তারা বাড়ির সামনে সার দিয়ে দাঁড়ায়নি কেন—তাঁর নতুন বউকে অভ্যর্থনা করার জন্য চাকরদের উপর শুধু রাগারাগি নয়, তাদের রীতিমত মারধোরও করলেন তিনি। তাঁর সেই মারমুখো চেহারা দেখে ক্যাথারিনাও ভয় পেয়ে গেল। শেষে কি তার স্বামী তাকেই মেরে বসবে নাকি! যে রাগী লোকটা। সে তখন স্বামীকে শান্ত হওয়ার জন্য অনুনয় করতে লাগল।

পেত্রুশিও যেন খানিকটা শান্ত হয়েই চাকরদের হুকুম করলেন, "খাবার নিয়ে এসো! দেখছ না, তোমাদের মনিব-গিন্নী খিদেয় কাতর হয়েছেন। তাড়াতাড়িতে নিজের বিয়ের ভোজটা পর্যন্ত খেয়ে আসতে পারেননি।"

হুকুম পাওয়া মাত্র তারা নানা রকম চমৎকার খাবার এনে হাজির করল পেত্রুশিও ও তাঁর স্ত্রীর সামনে। মাংসের থালায় হাত দিয়েই লাফিয়ে উঠলেন, "একি? একি? মাংসটা পুড়ে গেছে যে? এ কি মানুষের খাওয়ার উপযুক্ত? এই পোড়া মাংস খেলে তোদের মনিব-গিন্নীর অসুখ করবে না?"

ক্যাথারিনা তখন খিদেয় বড় কাতর। তা ছাড়া মাংসের কোথাও পোড়ার চিহ্ন সে দেখতে পাচ্ছে না। সে সবিনয়ে বলল, "এ মাংস তো পোড়া নয়! এ বেশ খাওয়া যাবে!"

কে শোনে সে-কথা ? পেত্রুশিওর গলা ক্রমশঃ সপ্তমে চড়তে লাগল।

"পোড়া মাংস ! এ অখাদ্য ! এ বিষ ! আমার বউটাকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলবার ফিকিরে আছিস্ তোরা !" বলতে বলতে প্রথমে মাংস, তারপরে অন্য সব খাবার ছুঁড়ে ঘরের বাইরে ফেলে দিলেন পেত্রুশিও।

ক্যাথারিনার তখন মনের অবস্থা শোচনীয়। খিদেয় তার পেট জ্বলছে। তার কান্না পেতে লাগল ! এ কী পাগলের পাল্লায় পড়েছে সে !

এদিকে পেত্রুশিও মিষ্টি কথায় বলছেন, "তোমার খাওয়া হল না, আহা, কষ্টই হবে কেটি ! কিন্তু অখাদ্য খাওয়ার চেয়ে অনাহারে থাকাই ভাল। অসুখে পড়ার চেয়ে একদিন খিদের কষ্ট সহ্য করা ভাল। চল, আমরা দুজনে ঘুমোই গিয়ে। পথে আসতে কষ্ট হয়েছে, শুয়ে পড়লেই এক ঘুমে রাত কেটে যাবে। তারপর সকালে উঠেই পেট ভরে খাওয়া যাবে।"

শোবার ঘরে ঢুকেই পেত্রুশিও চীৎকার শুরু করলেন "এ কী বিছানা ? ছিঃ ! ছিঃ ! এই বালিশ ! এই চাদর ? এই জঘন্য লেপ ? এ সব তোরা আমার স্ত্রীর বিছানায় পেতেছিস্ কোন্ সাহসে ? পথের ভিখারীও যে এমন বিছানায় শুতে পারে না !"

বলতে বলতে সেই দেড় হাত পুরু রেশমী চাদরে ঢাকা মোলায়েম বিছানা টেনে তুলে ঘরের বাইরে ছুড়ে দিলেন পেত্রুশিও। খাটের শক্ত কাঠে হেলান দিয়ে ক্যাথারিনা ঠায় বসে রইলেন সারা রাত। না খেয়ে তার গা-মাথা ঝিমঝিম করছে, আর তাকে চোখ বুজতে দেখলেই যা-হোক একটা কথা তুলে চিৎকার শুরু করেন পেত্রুশিও।

পরের দিনও এভাবে গেল। সারাদিন খেতে পেল না ক্যাথারিনা, সারা রাত সে ঘুমোতে পেল না। সে আধমরার মত হয়ে পড়ল।

কিন্তু তাকে তো আর সত্যিই মেরে ফেলার মতলব নয় পেত্রুশিওর, তাই তৃতীয় দিন সকালে খান-কয়েক পোড়া রুটির টুকরো নিজের হাতে ক্যাথারিনার কাছে নিয়ে এলেন পেত্রুশিও, বললেন, "দেখ দেখ কেটি, তোমার জন্যে নিজের হাতে খাবার তৈরি করে এনেছি আমি। চাকর-বাকরগুলো সব অপদার্থ, ওদের দিয়ে কোন একটা কাজ হওয়ার উপায় নেই !" সেই অখাদ্য পোড়া রুটিই খিদের চোটে গোগ্রাসে গিলতে হল ক্যাথারিনাকে।

তারপর পেত্রুশিও নিয়ে এলেন এক দরজীকে তার কাছে। সে ক্যাথারিনার জন্য গাউন টুপি সব তৈরি করে নিয়ে এসেছে। চমৎকার পোশাক সব দামী কাপড় দিয়ে তৈরি হয়েছে নিখুঁত ভাবে। ক্যাথারিনার খুবই পছন্দ হল পোশাকগুলি। কিন্তু পছন্দ-মাফিক পোশাক পরার ভাগ্য তার নেই, কারণ পেত্রুশিওর পছন্দ হল না একটা পোশাকও। পেত্রুশিও চিৎকার করে বললেন, "এ কী গাউন? এর নাম নাম কি টুপি? ছিঃ ছিঃ, আমার বউকে তোমরা কি মজুরানী ঠাউরেছ? এসব জঘন্য পোশাক একটাও চলবে না এ বাড়িতে!"

দরজী তো অবাক্! সারা দেশের সেরা দরজীখানা তার। ঠিক যেমন একালের ধনী মহিলাদের পছন্দ, তেমনি ধরনের পোশাক তৈরি করে সে এনেছে। এ পোশাককে কেউ অপছন্দ করতে পারে, এ সে স্বপ্নেও ভাবতে পারে না।

পেত্রুশিও দরজীকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন, "পোশাকগুলো নিয়ে বাড়ি চলে যাও এখন। ওর দাম আমি তোমার বাড়িতে এখনি পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

দরজী একথা শুনে আরও অবাক্ হয়ে গেল। সে পোশাকগুলি গুটিয়ে নিয়ে নিজের দোকানে চলে গেল।

পেত্রুশিও বললেন, "নতুন পোশাক না হয় নাই বা হল! এই পুরনো পোশাক নিয়েই চল আমরা পত্নয়ায় যাই। আসল কথা হচ্ছে টাকা। পকেটে যার টাকা আছে, সে ছেঁড়া কাপড় পরে যেখানেই যাক না কেন, লোকে তাকে খাতির করবেই।"

বাপের বাড়ি যাওয়ার কথা শুনেই ক্যাথারিনা আনন্দে নেচে উঠল, বলল, "চল, চল, এখনি যাওয়া যাক্!"

পেত্রুশিও বললেন, "হ্যাঁ, তাই চল! এখন সবে সকাল সাতটা। এখনি রওনা হলে দুপুরের খাওয়ার আগেই তোমাদের বাড়িতে পৌঁছে যাব।"

"সকাল সাতটা!" বিস্মিত ক্যাথারিনার মুখ দিয়ে সংশয়ের সুর বেজে উঠল, "সকাল সাতটা তুমি কী বলছো? এখন যে দুপুর দুটো। এখন রওনা হলে রাতের খাওয়ার সময় হয়ত কোনরকমে আমরা পৌঁছোতে পারব।"

আর যায় কোথায়? পেত্রুশিও বিগড়ে গেলেন।

"দুপুর দুটো? সকাল সাতটা নয়? সামান্য ঐ ঘড়ি আমার কথামত চলবে না? যাব না আমি কোথাও! যতদিন ঘড়ি আমার হুকুমমত না চলবে, ততদিন আমি নড়ব না ভেরোনা থেকে।"

পেত্রুশিওর খেয়ালের কাছে নত না হলে কোন কাজই যে হাসিল করা সম্ভব নয়, তা এতক্ষণে বুঝতে পেরেছে ক্যাথারিনা। তার নিজের মেজাজ, নিজের জেদ ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। সে দেখছে যে পেত্রুশিও তার চেয়ে ঢের বেশী জেদী আর বদমেজাজী। ওই রকম স্বামীর সঙ্গে বনিয়ে চলতে হলে নিজের জেদ, নিজের মেজাজ জলাঞ্জলি দিতে তো হবেই, এমনকি নিজের বুদ্ধি-বিবেচনাকেও শিকেয় তুলতে হবে। তা নইলে তার কষ্টের আর সীমা থাকবে না। তাই সে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "না, না, আমিই ঘড়ি দেখেছি ভুল। ঐতো সকাল সাতটাই বেজেছে ঘড়িতে! এখন রওনা হলে দুপুর নাগাদ আমরা নিশ্চয়ই পৌঁছে যাব।"

পেত্রুশিও মনে মনে খুব একচোট হেসে নিয়ে বললেন, "তাহলে চল, রওনা হওয়া যাক।"

পদুয়ার কাছাকাছি পৌঁছে রাস্তায় এক বুড়ো ভদ্রলোকের দেখা পেলেন পেত্রুশিও। তিনি আসছেন পিসা থেকে। আলাপ হতেই পেত্রুশিও জানতে পারলেন যে তিনি সেখানকার বিখ্যাত ধনী ব্যবসায়ী, নাম ভিনসেনসিও। তাঁর পুত্র লুসেনসিও অনেকদিন হল পদুয়ায় এসেছে; সেই অবধি তার আর কোন খবর নেই। কাজকর্ম সে কী-রকম কি করছে, তা দেখবার জন্যই তিনি পদুয়ায় যাচ্ছেন।

ভিনসেনসিওর সঙ্গে কথা কইতে কইতে দুজনে এগোতে থাকলেন পদুয়ার দিকে।

কথায় কথায় ভিনসেনসিও জানতে পারলেন যে তাঁর পুত্র লুসেনসিও পেত্রুশিওর শ্যালিকাকে বিয়ে করবে বলে ঠিক করে ফেলেছে, হয়তো বা এতদিনে ওদের বিয়েই হয়ে গেছে।

এদিকে লুসেনসিওবেশী ট্র্যানিওর পাঠানো জাল-ভিনসেনসিও ব্যাপটিস্টার সঙ্গে দেখা করে তাঁকে আশ্বাস দিয়েছে যে লুসেনসিওর সঙ্গে বিয়াংকার বিয়ে হলে পাত্রের দিক থেকে ভারী রকমের যৌতুক দেওয়া হবে। ব্যাপটিস্টা তার উদারতায় মুগ্ধ হয়ে এ বিয়েতে রাজী হয়েছেন, আর বলেছেন যে পাঁচ কানে জানাজানি হবার আগে এ বিয়ের বাগ্‌দানের

দলিলটা পাকাপাকি করে ফেলতে হবে ভিনসেনসিওর পড়ুয়ার বাড়িতে বসে সেই রাতেই।

ঠিক হয়েছে যে বিয়াংকা আগেভাগেই ভিনসেনসিওর বাড়িতে পৌঁছাবে একজন ভৃত্যকে সঙ্গে নিয়ে, তারপর সেখানে হাজির হবেন ব্যাপটিস্টা নিজে।

ট্র্যানিও কিন্তু মতলব করেছে যে, বিয়াংকা ভিনসেনসিওর বাড়িতে পৌঁছলেই আসল লুসেনসিও তাকে নিয়ে সোজা গির্জায় গিয়ে বিয়েটা সেরে ফেলবে। এজন্য সে গির্জার পাদরি ও দলিল-লেখকের সঙ্গে আগাম চুক্তিও করেছে।

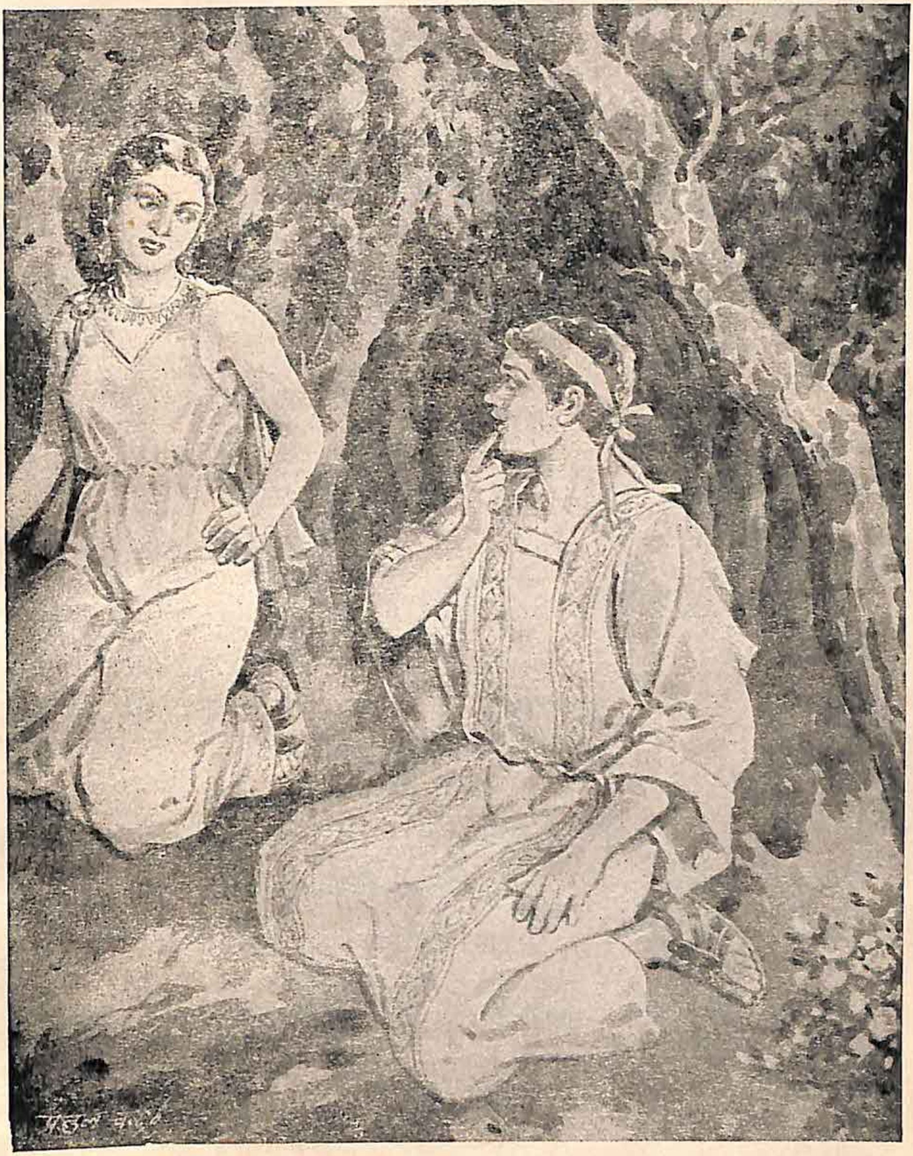
শেষ অবধি এই মতলবমতই কাজ হল।

কিন্তু মুশকিল বাধল আসল ভিনসেনসিও সেই রাতেই তাঁর পড়ুয়ার বাড়িতে হঠাৎ হাজির হওয়ায়। তখন সেখানে বিয়ের বাগ্‌দানের কাজকর্মে ব্যাপটিস্টা ও জাল-ভিনসেনসিও ব্যস্ত। এবার দুই ভিনসেনসিওর ভিতর বিষম ঝগড়া শুরু হয়ে গেল। এ বলে, "আমি ভিনসেনসিও", ও বলে "আমি ভিনসেনসিও।" আসল ভিনসেনসিওকেই সবাই মিলে জাল প্রমাণ করে জেলে পাঠাবার চিন্তা করছে। এমন সময়ে আসল লুসেনসিও বিয়াংকাকে নিয়ে সেখানে এসে হাজির। কিছু আগেই সে বিয়াংকাকে গোপনে বিয়ে করে ফেলেছে। এখন পিতাকে সামনে দেখে সে হাঁটু গেড়ে বসে তাঁর আশীর্বাদ চাইল। বিয়াংকাও তাই করল। অবস্থা দেখে ভিনসেনসিও নিজের পুত্র ও পুত্রবধূকে আশীর্বাদ না করে পারলেন না। জাল-ভিনসেনসিও ততক্ষণে সেখান থেকে সরে পড়েছে।

লুসেনসিওকে নিজের পরিচয় দিতে দেখে ট্র্যানিও সব গোপন কথা ফাঁস করে দিল। ব্যাপটিস্টার আর রাগ করবার কিছুই রইল না। তখন দুই বেয়াইয়ে মিলে বিয়ের উৎসব করার জন্য আয়োজন করলেন এক বিরাট ভোজের।

ভোজসভায় এসে গেছেন পেত্রুশিও ও ক্যাথারিনা, এমন কি হর্টেনসিও-ও তার সদ্য বিয়ে-করা বউকে নিয়ে ভোজ খেতে বসেছে।

সবাই খুশী হয়ে ভরপেট খেলেন। খাবার পর এল নানা রকমের পানীয়। মহিলারা এসব খান না বলে এ সময়টা তাঁরা খাওয়ার টেবিলে হাজির থাকেন না। তাই তিনজন নতুন বউ—ক্যাথারিনা, বিয়াংকা ও হর্টেনসিওর বউ এখন অন্য ঘরে সরে গেছেন।



ডেমিট্রিয়াস্ জেগে উঠে হেলেনাকে দেখতে পেয়েই তাকে ভালবাসার কথা বলতে লাগল।

পানীয় খেতে খেতে হালকা হাসি-তামাশা শুরু হল। পেত্রুশিওকে ঠাট্টা করতে লাগল সবাই। পেত্রুশিও খুবই ঠকেছেন বিয়ের ব্যাপারে —এই রকমই সকলের মনোভাব। নতুন বউ তিনটির মধ্যে স্ত্রী হিসাবে ক্যাথারিনা সবচেয়ে খারাপ হবে, একথাই যেন সবাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানাভাবে পেত্রুশিওকে জানাতে চায়।

পেত্রুশিও কিন্তু কোন কথাই কানে না তুলে দিব্যি আরামে পান করে চলেছেন। অবশেষে ক্যাথারিনার বাপ হয়েও ব্যাপটিস্টা যখন বলে বসলেন যে পেত্রুশিওর বরাতে স্ত্রীর জন্য সারাজীবন অশান্তি ভোগই আছে, তখন পেত্রুশিও আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। তিনি বললেন, "বিয়াংকা ও হর্টেনসিওর স্ত্রীর চেয়ে ক্যাথারিনা অনেক বেশী সুশীলা ও স্বামীর বাধ্য। সে জানে যে স্বামীর বাক্য বাইবেলের আদেশের মতই, তা পালন না করলেই মহাপাপ।"

সবাই হেসে উঠল হো হো করে।

"আপনারা বিশ্বাস করছেন না? বেশ, পরীক্ষা করুন! বাজি ধরুন।" —বলে উঠলেন পেত্রুশিও।

লুসেনসিও এবং হর্টেনসিও ক্যাথারিনাকে ভাল করেই চেনে, তাই পেত্রুশিও যে বাজিতে হারবেন, এ বিষয়ে দুজনেই নিশ্চিত। তাই তারা সঙ্গে সঙ্গেই বাজি ধরলো একশো মোহর। ঠিক হল—একে একে তাঁরা তিনজন নিজেদের স্ত্রীকে ডেকে পাঠাবেন খাওয়ার টেবিলে আসবার জন্য। যাঁর স্ত্রী স্বামীর ইচ্ছা তখনি পালন করবে, বাজি সে-ই জিতবে।

প্রথমে লুসেনসিও বিয়াংকাকে ডেকে পাঠাল, কিন্তু বিয়াংকা এল না। খবর পাঠাল যে সে এখন অন্য একটা কাজে ব্যস্ত রয়েছে।

এবার হর্টেনসিও নিজের স্ত্রীকে বলে পাঠাল, "আমি মিনতি করছি —তুমি যেন এখনি একবার খাওয়ার টেবিলে এসে আমার সঙ্গে দেখা কর।"

পেত্রুশিও ঠাট্টা করে বললেন, "মিনতি? মিনতি করলে কি আর নিজের স্ত্রী না এসে পারে?"

হর্টেনসিও রেগে বলল, "তুমি কিন্তু মিনতি করেও তোমার স্ত্রীকে এখানে আনতে পারবে না।"

হর্টেনসিওর স্ত্রীও এল না। সে বলে পাঠাল, "তোমরা কী একটা হাসি-তামাশার ব্যাপার শুরু করেছ বলে মনে হচ্ছে। ওখানে যাব না আমি।"

তখন পেত্রুশিও নিজের ভৃত্যকে বললেন, "যা তো, আমার স্ত্রীকে গিয়ে বল্ যে আমি তাকে এখুনি এখানে আসতে আদেশ করছি।"

সবাই বলাবলি করতে লাগল—ক্যাথারিনার উপর আদেশ! ক্যাথারিনার কাছ থেকে এর একটা কড়া জবাবের প্রত্যাশায় তারা উৎকণ্ঠিত হয়ে দরজার দিকে তাকিয়ে রইল।

কিন্তু, এ কী?—সবাই ব্যাপার দেখে থ মেরে গেল। ক্যাথারিনা তাড়াতাড়ি আসছে খাওয়ার টেবিলের দিকে। এসেই সে পেত্রুশিওকে জিজ্ঞাসা করল, "আমায় কেন ডেকেছ?"

পেত্রুশিও বললেন, "তোমার বোনকে আর হর্টেনসিওর স্ত্রীকে ডেকে পাঠিয়েছিল তাঁদের স্বামীরা। ওঁরা আসেননি। স্বামীর কথা যে সঙ্গে সঙ্গে পালন করা উচিত, তা ওঁদের বুঝিয়ে এখানে নিয়ে এসো তো।"

ক্যাথারিনা তাড়াতাড়ি চলে গেল। কিছুক্ষণ বাদেই বিয়াংকাকে ও হর্টেনসিওর স্ত্রীকে ধরে নিয়ে এল ক্যাথারিনা।

পেত্রুশিও বাজি জিতলেন। বদমেজাজী মেয়ে ক্যাথারিনা পেত্রুশিওর হাতে পড়ে এত কম সময়ের মধ্যে একেবারে পালটে গেছে দেখে ব্যাপটিস্টাও খুশী হয়ে পেত্রুশিওকে মোটা রকমের পুরস্কার দেবেন বলে সকলের সামনে ঘোষণা করলেন।



এ মিড-সামার নাইটস্ ড্রীম

এথেন্সের ডিউক মহাবীর থিসিউস্ তুর্জয় আমাজানদের লড়াইয়ে হারিয়ে তাদের রানী হিপোলিটাকে বিয়ে করবেন বলে ঠিক করেছেন। রানী হিপোলিটা এসে গেছেন থিসিউসের রাজধানী এথেন্স শহরে। আর চারদিন চার রাত বাদে আগামী পূর্ণিমার দিনে তাঁদের বিয়ে হবে।

থিসিউসের ইচ্ছা, তাঁদের বিয়েতে সারা দেশে এমন একটা উৎসব হবে, যা আগে আর কেউ এমনটা দেখেনি। এই উৎসবের আয়োজনের ভার তিনি দিয়েছেন মন্ত্রী ফাইলোস্ট্রেটের উপরে। জাঁকজমকের সঙ্গে বিয়েটা কিভাবে হবে, সেই কথাই থিসিউস্ বোঝাচ্ছিলেন রানী হিপোলিটাকে, এমন সময় ইজিউস্ এসে তাঁকে অভিবাদন জানালেন। তিনি সঙ্গে এনেছেন একটি সুন্দরী কিশোরী এবং তুটি রূপবান্ যুবককে।

ইজিউস্ এথেন্সের একজন মানী লোক, বয়সও হয়েছে তাঁর অনেক। থিসিউস্ তাঁকে খাতির দেখিয়ে তাঁর কাছে আসার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন।

ইজিউস্ খুব গরম হয়েই বললেন, "মহামান্য ডিউক! আপনার কাছে এসেছি একটা অভিযোগ নিয়ে। আপনি এর এখনি বিচার করুন!"

থিসিউস্ বললেন, "ব্যাপার কি? আমার কাছে সব কিছু খুলে বলুন। আমি নিশ্চয়ই আপনার অভিযোগের যথাযোগ্য বিচার করব।"

ইজিউস্ বললেন, "আজ আমার অভিযোগ নিজের মেয়ে হার্মিয়ার

বিরুদ্ধে", এই বলে সঙ্গের মেয়েটিকে দেখিয়ে আবার বলতে লাগলেন, "আমি ওর বিয়ে ঠিক করেছি ডেমিট্রিয়াসের সঙ্গে, আর ডেমিট্রিয়াসও এ বিয়েতে রাজী। হার্মিয়াকে সে যথেষ্ট ভালবাসে, কিন্তু হার্মিয়া আমার অবাধ্য; সে আমার পছন্দ-করা পাত্রকে বিয়ে করতে চায় না। সে নাকি ভালবেসেছে লাইসাণ্ডারকে!"

অভিযোগ পেশ করে তিনি সঙ্গের যুবক দুজনের মধ্যে কে ডেমিট্রিয়াস, আর কে লাইসাণ্ডার, তা থিসিউস্‌কে চিনিয়ে দিলেন।

ইজিউস্ আরও বললেন, "ঐ যে লাইসাণ্ডার—ও অতি খারাপ। আমি ওকে কতবার নিষেধ করেছি আমার মেয়ের কাছে আসতে। তবুও সে নানাভাবে আমার মেয়েকে ভালবাসা জানিয়েছে, চিঠি লিখেছে, কবিতা শুনিয়েছে, উপহার ও মিষ্টান্ন এনে দিয়েছে, এমন কি রাতে ওর জানালার নীচে দাঁড়িয়ে গান গেয়েছে। এতে একটা কিশোরীর মন আর কতদিন ঠিক থাকে বলুন? সে-ও লাইসাণ্ডারের প্রেমে পড়েছে। ডেমিট্রিয়াস সব দিক দিয়ে যোগ্য পাত্র, আমি তাকে পছন্দও করেছি। এসব জেনেশুনেও তাকে হার্মিয়া বিয়ে করতে অস্বীকার করছে। বহুযুগ ধরে প্রচলিত এথেন্সের সুপ্রাচীন আইন অনুসারে আপনি এর বিচার করুন, আর আমার মেয়ে আমার কথা না শুনলে তার মৃত্যুদণ্ড দিন।"

ইজিউস্ থামলে থিসিউস্ হার্মিয়াকে বললেন, "শোনো হার্মিয়া! তোমার পিতাই তোমার ঈশ্বর। তাঁর অবাধ্য হওয়া তোমার মহাপাপ, তাঁর আদেশ পালন করাই তোমার কর্তব্য। ডেমিট্রিয়াস তো কোন দিক্ দিয়েই অপছন্দ করবার মত পাত্র নয়!"

হার্মিয়া জবাব দিল, "লাইসাণ্ডারও তো তাই!"

থিসিউস্ বললেন, "তা হতে পারে, তবে সে তোমার পিতার মত পায় নি। তাই তো ডেমিট্রিয়াসকেই বিয়ে করা তোমার উচিত।"

হার্মিয়া জিজ্ঞাসা করল, "ডেমিট্রিয়াসকে বিয়ে করতে রাজী না হলে আমি কি শাস্তি পাব, তা কি জানতে পারি?"

থিসিউস্ বললেন, "হয় তোমার প্রাণদণ্ড হবে, নয় তো সন্ন্যাসিনীর মত মানুষের সমাজ ছেড়ে সারাজীবন তোমাকে একাকী কাটাতে বাধ্য করা হবে। তাই বলি, হার্মিয়া, ভাল করে ভেবে দেখ।"

হার্মিয়া বলল, "যাকে আমার প্রাণ চায় না, তাকে আমি কিছুতেই

আমার স্বামী বলে গ্রহণ করতে পারব না ; বরং যদি মরতে হয় তো মরব —এই আমার শেষ কথা।"

থিসিউস্ বললেন,—"না—না, হার্মিয়া! এত তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নিচ্ছ কেন! আগামী পূর্ণিমায় আমার বিয়ে। ওই দিনের মধ্যে হয় ডেমিট্রিয়াসকে বিয়ে কর, নয়তো পিতার কথার অবাধ্যতার জন্য মরতে প্রস্তুত থেকো।"

ডেমিট্রিয়াস তখন হার্মিয়াকে বোঝাবার চেষ্টা করল। এতে লাইসাণ্ডার ক্ষেপে গিয়ে থিসিউসের কাছে ডেমিট্রিয়াসের বিরুদ্ধে বলতে লাগল। সে বলল, "মহামান্য ডিউক! হার্মিয়ার প্রতি আমার ভালবাসায় কোন খাদ নেই। কিন্তু ডেমিট্রিয়াস? সে তো এর আগে নেদারের মেয়ে হেলেনাকে ভালবেসেছিল। হেলেনা আজও তাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে ও তাকে বিয়ে করার জন্য এখনও পাগল। আর ডেমিট্রিয়াস তাকে ছেড়ে দিয়ে আমার…"

কথাটা শেষ করতে না দিয়েই থিসিউস্ বললেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, হেলেনার সঙ্গে যে ডেমিট্রিয়াস ভাল ব্যবহার করেনি, তা আমিও শুনেছি। ও হেলেনাকে বিয়ে করুক এটা আমার ইচ্ছা। কিন্তু আমার নিজের ইচ্ছা-অনিচ্ছায় তো কোন কাজ হবে না। যা কিছু হবে, তা আইন অনুসারে হবে। এ দেশের চিরদিনের আইন হচ্ছে যে, মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে তার বাবার মতই বজায় থাকবে। বাবা মেয়ের জন্য যে পাত্র পছন্দ করে দেবেন, তাকে বিয়ে করতে মেয়ে আইনতঃ বাধ্য। এ-আইন রদ করবার ক্ষমতা আমার নেই। কাজেই হার্মিয়াকে তার বাবার কথামত ডেমিট্রিয়াসকে বিয়ে করতেই হবে। তা না করলে আইনের নির্দেশমত তাকে হয় মরতে হবে, নতুবা কোন মঠের সন্ন্যাসিনী হতে হবে।"

এই বলে তিনি রানী হিপোলিটাকে নিয়ে সেখান থেকে চলে গেলেন। ইজিউস্ ও ডেমিট্রিয়াসও তাঁদের পেছনে পেছনে গেলেন। এবার লাইসাণ্ডার ও হার্মিয়া নিরিবিলিতে কথা কইবার একটা সুযোগ পেল।

দুজনে পরামর্শ করে একটা চমৎকার মতলব বার করে ফেলল। লাইসাণ্ডারের এক বিধবা মাসীর বাড়ি এথেন্স থেকে মাইল কুড়ি দূরে। এথেন্স রাজ্যের এলাকার বাইরে ঐ জায়গাটা। লাইসাণ্ডার বলল, "চল, আমরা দুজনে মাসীর বাড়ি পালিয়ে যাই। সেখানে গিয়ে বিয়ে করলে এথেন্সের এই অন্যায় আইনের আওতায় আমরা পড়ব না। মাসীর নিজের

কোন ছেলেপিলে নেই, আমাকেই তিনি ছেলের মতন ভালবাসেন। সেখানে গেলে আমাদের কোন অসুবিধা হবে না।"

এ-প্রস্তাবে হার্মিয়া সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গেল। ঠিক হল—পরদিন রাতে দুজনেই নিজের নিজের বাড়ি থেকে পালিয়ে এথেন্সের তিন মাইল দূরে যে বন আছে, সেখানে গোপনে দেখা করবে। তারপর তারা একসঙ্গে হেঁটে চলে যাবে মাসীর বাড়ি।

ওদের কথাবার্তা শেষ হতে না হতেই কাঁদতে কাঁদতে হেলেনা সেখানে এসে হাজির। ডেমিট্রিয়াসের খোঁজে ঘুরে বেড়াচ্ছে সেই অভাগিনী। এসে শুনল যে তার ভালবাসার মানুষটি একটু আগেই ডিউকের সঙ্গে সেখান থেকে চলে গেছে। তখন সে হার্মিয়াকে দেখতে পেয়েই মনের দুঃখে অধীর হয়ে বলল, "তোমার জন্যই আমার আজ এই হেনস্থা। ডেমিট্রিয়াস আগে আমাকেই ভালোবাসত। এখন তুমি তাকে ছিনিয়ে নিয়েছ আমার কাছ থেকে। সেই পাপেই তোমার সর্বনাশ হবে।"

হার্মিয়া তার মনের দুঃখ বোঝে, তাই রাগ না করে মিষ্টি কথায় তাকে বোঝাতে লাগল—"কোন চিন্তা করো না বোন! তোমার পথের কাঁটা নিজে থেকে চিরদিনের মত দূরে সরে যাচ্ছে। আমি লাইসাণ্ডারের সঙ্গে এথেন্স থেকে পালিয়ে যাচ্ছি। আগামী কাল রাতে আমরা বাড়ি থেকে পালিয়ে শহরের বাইরের বনভূমিতে গোপনে দেখা করব, তারপর সেখান থেকে চলে যাব বহুদূরে, কেউ আর আমাদের খোঁজ পাবে না। আমাকে যখন আর দেখতে পাবে না, তখন ডেমিট্রিয়াস তোমাকে আবার ভালো-বাসতে শুরু করবে, তুমি তখন তাকে বিয়ে করে আবার সুখী হবে।"

এই কথা বলে হার্মিয়া চলে গেল লাইসাণ্ডারকে নিয়ে। হেলেনা চললো ডেমিট্রিয়াসের খোঁজে। পথে ডেমিট্রিয়াসকে দেখতে পেয়ে হেলেনা ভালবাসার দোহাই দিয়ে তাকে নিজের বশে আনবার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। ডেমিট্রিয়াস তাকে ঘৃণায় প্রত্যাখ্যান করে চলে যাচ্ছে দেখে হেলেনা সহসা নারীসুলভ হিংসায় জ্বলে বিদ্রূপ করে বলে উঠল, "তোমার চোখের মণি—তোমার মনের পাখি যে এবার খাঁচা ছেড়ে পালাচ্ছে লাইসাণ্ডারকে নিয়ে!"

একথা শুনেই ডেমিট্রিয়াস থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর হেলেনার কাছে ফিরে এসে ঠাট্টার সুরে বলল, "তবে আর কি! এবার থেকে আমি তোমারই হব।"

"সত্যি বলছ, তুমি এখন থেকে আবার আমার হবে!"—এই বলে হেলেনা আগ্রহভরে ডেমিট্রিয়াসের দিকে তাকাল।

ডেমিট্রিয়াস জোর দিয়েই বলল, "নিশ্চয়ই, আমিও তোমাকে নিয়ে পালিয়ে যাব।"

"আমিও তাতে রাজী। কিন্তু কোথায় পালিয়ে যাবে?"—হেলেনা প্রশ্ন করল।

ডেমিট্রিয়াস জবাব দিল, "যেখানে লাইসাণ্ডার ও হার্মিয়া পালিয়ে যাচ্ছে, সেখানেই আমরা যাব।"

"ওরা তো প্রথমে যাচ্ছে ওই বনে।"—এই বলে সরল হেলেনা সাত পাঁচ না ভেবে হার্মিয়া ও লাইসাণ্ডারের বাড়ি থেকে পালানোর কথা যা কিছুক্ষণ আগে শুনেছে, সবই খুলে ডেমিট্রিয়াসকে বলল। ডেমিট্রিয়াসকে যে সে সত্যিই মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাসে, তার কাছে গোপন করার যে তার কিছুই নেই।

ডেমিট্রিয়াস মনে মনে ফন্দি আঁটল—ওদের পালানোর মতলব সে বিফল করে দেবে! পরদিন রাতে সেও যাবে ওই বনে, দরকার পড়লে সে লাইসাণ্ডারকে হত্যা করে হার্মিয়াকে জোর করে কেড়ে নেবে।

* * *

থিসিউস্ রাজা হিসাবে খুব ভাল। প্রজারা সবাই তাঁকে ভালবাসে। তাঁর বিয়েতে আনন্দ করবে সবাই। ছোটখাটো কারিগরেরা মতলব আঁটল—তারা বিয়ের দিন ডিউক ও তাঁর নূতন রানীকে দেখাবার জন্য একটা নাটক অভিনয় করবে।

পিরেমাস ও থিস্‌বির প্রেমের গল্প নিয়ে নাটক লিখেছে ছুতোর কুইন্স্। নাটকটির পরিচালনাও সে-ই করবে। সে নাটকটির নাম দিয়েছে, "পিরেমাস ও থিস্‌বির চরম বেদনাদায়ক, অথচ মিলনান্তক নিষ্ঠুর মৃত্যু।" নাটকটির কাহিনী এইরকম।

পিরেমাস ভালবাসত থিস্‌বিকে। কিন্তু থিস্‌বির বাবা তাদের বিয়েতে বাধা দিলেন। বাড়ি থেকে বেরুনো বন্ধ হলো থিস্‌বির। তখন গোপনে পরামর্শ করতে লাগল দুজনে। থিস্‌বিদের বাড়িতে আছে পাঁচিল-ঘেরা বাগান। সেই পাঁচিলের এপিঠে থিস্‌বি, ওপিঠে পিরেমাস! পাঁচিলের দেয়ালে একটা গর্ত, তারই ভিতর দিয়ে কথাবার্তা চালায় তারা। তারা

মতলব করল—নিজের বাড়ি থেকে গোপনে পালিয়ে বনের মধ্যে নাইনাসের কবরে গিয়ে দুজনে দেখা করবে।

থিস্‌বি নাইনাসের কবরের কাছে আগে পৌঁছালো। তাকে দেখে এক সিংহ তেড়ে এলো গর্জন করে। থিস্‌বি ভয়ে দৌড়ে পালাল, কিন্তু পালানোর সময় তার গায়ের ওড়না পথে পড়ে গেল। সিংহ সেখানে এসে থিস্‌বিকে পেলে না, পেল তার একখানা ওড়না। রাগের মাথায় সিংহ সেই ওড়না চিবিয়ে ছিঁড়ে রেখে গেল। এর একটু আগেই সিংহটা কোন একটা শিকার ধরেছিল, তারই রক্ত মাখানো ছিল ওর মুখে ও থাবায়। ওড়না ছিঁড়বার সময় তাতে লেগে গেল সেই রক্ত। পিরেমাস এসে থিস্‌বিকে পেলো না, পেলো তার রক্তমাখা ওড়না। একটু আগে সে এই দিক্‌টাতে সিংহের গর্জন শুনেছিল। তার নিশ্চিত ধারণা হল যে থিস্‌বি সিংহের খপ্পরে পড়েছে। থিস্‌বি আর বেঁচে নেই মনে করে সে নিজের বুকে ছোরা বসিয়ে মরে গেল সেখানেই।

একটু পরেই থিস্‌বি সেখানে ফিরে এল। পিরেমাস মরে গেছে দেখে সে সেই ছোরাটা তুলে নিয়ে তখনি নিজের বুকে বিঁধিয়ে দিল। মারা পড়ল সেও।

তাঁতী বটমকে দেওয়া হয়েছে পিরেমাসের ভূমিকা। কারণ তার চেহারা ভাল, গলার আওয়াজও মিঠেল। হাপর মেরামত করে ফ্লুট, তার বয়স কম, গলার স্বরও মেয়েলী, তাকেই দেওয়া হয়েছে থিস্‌বির ভূমিকা। সিংহ হবে স্নাগ, পিরেমাসের বাবা হবে স্নাউট, থিস্‌বির মা হবে স্টারভেলিং, আর কুইন্স্‌ নিজে সাজবে থিস্‌বির বাবা। এরা সবাই এক একজন ছোটখাট কারিগর।

শহরের ভিতরে মহড়া দেবার জায়গা মেলে না। যেখানেই ওরা মহড়া দিতে বসবে, হাজার হাজার লোক জমে যাবে সেখানে। হাজার জনে পরামর্শ দেবে হাজার রকম, বিরক্ত করে মারবে তাদের। তাছাড়া শহরসুদ্ধ লোক আগে থাকতে জেনে ফেলবে ওদের অভিনয়ের কথা। সেটা ওদের মোটেই ইচ্ছে নয়। ওরা হঠাৎ আসরে নেমে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিতে চায়।

তাই ওরা ঠিক করল—আগামী রাতে ওরা শহরের বাইরের বনভূমিতে গিয়ে ফুটফুটে জোছনায় নাটকের মহড়া দেবে। সে বনে সাপ নেই, ব্যাং নেই, পোকা-মাকড় নেই, এমন কি কাঁটাবন বা আগাছাও

নেই। ঝরঝর ঝরনা ছুটছে, ভুরভুর ফুলের গন্ধ বইছে, মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে নাইটিংগেলের মধুর গান। নামে বন হলেও সেটা মস্ত বড় ফুলবাগানেরই মত, রাতে সেখানে যেতে কোনই ভয় নেই।

* * *

পরদিন রাতে তিনটি দলে লোক জড় হল সেই বনভূমিতে। লাইসাণ্ডার ও হার্মিয়া একদলে আর ডেমিট্রিয়াস ও হেলেনা আর একটি দলে। আরও একদল রয়েছে সেই ছোটখাটো কারিগরেরা। তারা নাটকের মহড়া দেবার মত ভাল একটা জায়গা খুঁজছে।

এরা ছাড়া আর একটি দলও সেই রাতে সেখানে হাজির হয়েছে। এরা কিন্তু মানুষ নয়, এরা পরী। এরা প্রায়ই জোছনা রাতে এই মনোরম উপবনে এসে নাচগান আমোদ-আহ্লাদ করে।

কিন্তু আর আর পরীদের আমোদ-আহ্লাদ করবার মত মনের অবস্থা নেই। ঝগড়া হয়েছে তাদের রাজা ওবেরন ও তাঁর রানী টাইটানিয়ার মধ্যে। তাই পরীদের মধ্যে আজ দুটো শিবির হয়েছে। তাদের রাজা-রানীর মনে মিল না থাকলেই তারাই বা মিলেমিশে আনন্দ করে কেমন করে? ঝগড়ার কারণ হচ্ছে এই—রানী টাইটানিয়া একটি অতি সুন্দর মানুষের ছেলেকে চুরি করে নিয়ে এসেছেন সুদূর ভারতবর্ষ থেকে। ছেলেটিকে রাজা ওবেরনের ভারী পছন্দ হয়েছে, তিনি রানীর কাছ থেকে ওকে পেতে চান। তাঁর ইচ্ছা ছেলেটিকে নিজের খাস চাকর হিসেবে রাখা। রানী টাইটানিয়া তাঁর হাতে ছেলেটিকে তুলে দিতে রাজী নন, আর এই নিয়ে দুজনের রোজ ঝগড়া চলছে। রাজা ওবেরন চেষ্টা করছেন—কী করে রানীকে জব্দ করে তাঁর কাছ থেকে ছেলেটিকে আদায় করা যায়, আর রানী টাইটানিয়া ছেলেটিকে সবসময় রাজার নজর থেকে বাঁচিয়ে তাকে নিজের কাছে রাখবার আপ্রাণ চেষ্টা করছেন।

অনেক চিন্তার পর রাজা ওবেরন একটা ফিকির বার করলেন। কবে কোন্ যুগে কামদেব কোন্ এক দেবতাকে একদিন তাক্ করে একটা ফুলবাণ ছুঁড়েছিলেন, আর তা দেখে সেই দেবতা উড়ে পালালে বাণটা পড়ে ছিল একটা ফুলের উপর। সেই ফুলটা সেদিন থেকে একটি বিশেষ গুণের অধিকারী হয়েছে। ঘুমের সময় কারও চোখের পাতায় যদি ঐ ফুলের রস মাখিয়ে দেওয়া যায়, তবে ঘুম ভেঙে উঠে সে যাকে প্রথমেই দেখবে, তারাই প্রেমে পাগল হয়ে উঠবে—তা সে মানুষই হোক,

পরীই হোক্, আর জন্তু-জানোয়ারই হোক! এ-ফুলের নাম 'অলস-প্রণয়'।

পক হল ওবেরনের বিশ্বাসী দূত। সে যেমন কাজের লোক তেমনি আমুদে। ওবেরন গোটাকয়েক 'অলস-প্রণয়' ফুল নিয়ে আসবার জন্য তার উপরেই ভার দিলেন।

পক হাওয়ায় ভর করে চলে গেল এবং একটু পরেই সেই ফুল কয়েকটা নিয়ে এল।

এদিকে লাইসাণ্ডার ও হার্মিয়ার খোঁজে ডেমিট্রিয়াস বনের সেইদিকে হাজির হয়েছে। তার পেছনে পেছনে এসেছে হেলেনা। সে এতক্ষণে বুঝতে পেরেছে যে লাইসাণ্ডার ও হার্মিয়ার পালানোর কথা ডেমিট্রিয়াসকে বলে দিয়ে সে বড়ই ভুল করেছে। সে ডেমিট্রিয়াসের পায়ে পড়ে অনেক কাকুতি মিনতি করেছে ওদের ছেড়ে দেবার জন্য, কিন্তু ডেমিট্রিয়াস আজ তার সংকল্পে অটল। সে হয় লাইসাণ্ডারকে হত্যা করবে, নয়তো তার সঙ্গে লড়ে নিজের প্রাণ বিসর্জন দেবে। তাই হেলেনা তার পিছু ছাড়বে না কিছুতেই। ডেমিট্রিয়াস তাকে তাড়িয়ে দিতে চায়, কিন্তু হেলেনা তাকে ছেড়ে কিছুতেই চলে যাবে না। মুখে তার সেই একই বুলি— "আমায় ছেড়ে যেও না, আমায় দয়া কর, আমি তোমায় নিজের প্রাণের চেয়ে ভালবাসি।" আর ডেমিট্রিয়াসের আগের মত একই সাফ জবাব, "আমি তোমায় ভালবাসি না, ভালবাসবো না কোনদিনও। তুমি আমার আশা ছেড়ে দিয়ে নিজের ঘরে ফিরে যাও।"

শেষ পর্যন্ত হেলেনাকে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে আছড়ে ফেলে ডেমিট্রিয়াস বনের ভিতর দৌড় দিল। হেলেনাও কাঁদতে কাঁদতে তার পেছনে পেছনে ছুটতে লাগল।

হেলেনার কান্নাকাটি শুনে তার উপর দয়া হল রাজা ওবেরনের। তিনি হেলেনার দুঃখ দূর করবার জন্য পৃথক আদেশ করলেন যে ওই যুবকটি যখন বনে ঘুরতে ঘুরতে শ্রান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়বে, তখন যেন তার চোখে 'অলস প্রণয়' ফুলের রস মাখিয়ে দেওয়া হয়।

ঠিক সেই সময়ে বনের অন্য দিকে রানী টাইটানিয়া সখীদের সঙ্গে আনন্দ করছেন। অতি মনোরম সেই জায়গাটির পাশ দিয়ে কল কল সুরে বইছে একটা ছোট্ট নদী। তার উঁচু পাড়ে সবুজ ঘাস, আর ঘাসের উপর ঝলমল করছে সোনালী জোছনা। মাঝে মাঝে গাছে গাছে নানা

রকম বনফুল মৃদুমন্দ হাওয়ায় দুলছে। অদূরে বনের ভিতরে শোনা যায় পাখিদের সুমধুর গান আর ঝিল্লীর ঝিঁঝি।

সখীদের গান শুনতে শুনতে ঘুম এল টাইটানিয়ার চোখে। এর আগেই তিনি তাদের এক একটি কাজের ভার দিয়েছেন, তাই রানী ঘুমিয়ে পড়লে তারা এদিকে ওদিকে চলে গেল। ঘুমন্ত রানী পড়ে রইলেন একা।

এই সুযোগেরই জন্য ওত পেতে ছিলেন ওবেরন। তিনি আড়াল থেকে টাইটানিয়াকে লক্ষ্য করছিলেন এতক্ষণ, এবার তাঁকে একাকী ঘুমন্ত পেয়ে তিনি তাড়াতাড়ি এসে টাইটানিয়ার চোখে 'অলস-প্রণয়' ফুলের রস ভাল করে মাখিয়ে দিলেন।

ওদিকে বনের আর একধারে লাইসাণ্ডার ও হার্মিয়া এসেছে। দুজনে খুবই পরিশ্রান্ত, তাই তারা ঠিক করলে যে বনের মধ্যে খানিকটা ঘুমিয়ে বিশ্রাম করে তারপর পালাতে শুরু করবে। হার্মিয়া শুয়ে ঘুমোল লাইসাণ্ডার থেকে কিছু দূরে—বিয়ে যে তাদের এখনও হয়নি!

পক ভুল করে ঘুমন্ত লাইসাণ্ডারের চোখে এই সুযোগে 'অলস-প্রণয়' ফুলের রস মাখিয়ে দিয়ে রাজা ওবেরনকে জানাল যে তাঁর আদেশ সে পালন করেছে।

ডেমিট্রিয়াসের পেছনে পেছনে ছুটে চলেছে হেলেনা বনের ভিতর দিয়ে, কিন্তু একটা বলিষ্ঠ পুরুষের সঙ্গে সে পাল্লা দিয়ে দৌড়বে কেমন করে? সে শীঘ্রই পিছিয়ে পড়ল, আর বনে ঘুরতে ঘুরতে দেখতে পেল —ঘাসের উপর লাইসাণ্ডার শুয়ে রয়েছে। লাইসাণ্ডারকে সাবধান করে দেবার জন্য সে তাকে ডেকে তুলল। হেলেনাকে দেখামাত্রই লাইসাণ্ডার তার প্রতি মুগ্ধ হয়ে নিজের প্রণয় নিবেদন করল। হার্মিয়ার ভালবাসার কথা সে বেমালুম ভুলে গেল 'অলস-প্রণয়' ফুলের গুণে।

লাইসাণ্ডারের এই রকম অসৎ আচরণের জন্য হেলেনা মোটেই প্রস্তুত ছিল না। তার মন তখন ডেমিট্রিয়াসের প্রতি প্রেমে বিভোর। সে লাইসাণ্ডারকে যা মুখে আসে তাই বলে তিরস্কার করে অনেক কড়া কড়া কথা শুনিয়ে ছুটে পালিয়ে গেল। আর লাইসাণ্ডারও ঘুমন্ত হার্মিয়াকে সেখানে ফেলে রেখে হেলেনার পিছু নিল।

খানিকক্ষণ পরে হার্মিয়ার ঘুম ভেঙে গেল। ঘুমের মধ্যে সে দুঃস্বপ্ন দেখছিল—তার বুকের উপর যেন একটা কাল সাপ ঘোরাফেরা করে

খেলা করছে! ঘুমের ঘোরে সে "লাইসাণ্ডার! লাইসাণ্ডার! আমাকে বাঁচাও!" বলে চীৎকার করতে লাগল। তারপর ঘুম ভেঙে গেলে লাইসাণ্ডারকে দেখতে না পেয়ে সে পাগলিনীর মত চারদিকে ছোটাছুটি করতে লাগল।

রানী টাইটানিয়া যেখানে ঘুমিয়ে আছেন, বনের সেই দিকে একটু বাদে নাটুকে কারিগরের দল এসে হাজির। "বাঃ, চমৎকার জায়গাটা!" —বলে উঠল পরিচালক কুইন্স, "এখানেই আমরা নাটকের মহড়া দেব। এস! পিরেমাস, প্রথমে তোমার কথা শুরু কর! থিস্‌বি, তুমি দাঁড়াও ওর সামনে!"

তাঁতী বটম গলা ফুলিয়ে বলা আরম্ভ করল—"থিস্‌বি, ফুলের গন্ধ বইছে কত মধুর; তেমনি গন্ধ আসছে তোমার নিশ্বাসের;—কিন্তু ঐ একটা শব্দ শোনা যায় না! কিসের শব্দ? তুমি দাঁড়াও ফ্লুট, আমি ওদিকটা একবার দেখে আসি!"

তাঁতী বটম হঠাৎ নাটকের মহড়া ছেড়ে বনের আর একদিকে দৌড়ে গেল।

এবারে থিস্‌বির কথা ফ্লুট বলতে শুরু করল—"চোখ-ধাঁধানো পিরেমাস, লিলি ফুলের মত সাদা তোমার গায়ের রং। কাঁটা-গোলাপের ডগায় ডগায় ফোটে যে লাল গোলাপ, তারই মতন লালচে আভা ফুটে বেরোয় সেই সাদার ভিতর থেকে। বয়স তোমার কম, ছুটোছুটিতে তোমার শ্রান্তি নেই। ঘোড়ার মত পরিশ্রমী আর বিশ্বস্ত তুমি—হে সুন্দরী ইহুদী! আমি নিনির সমাধিতে দেখা করব তোমার সাথে—পিরেমাস!"

"নিনির সমাধি নয়, নাইনাসের সমাধি"—বলে উঠল পরিচালক কুইন্স্।—"তাছাড়া এখুনি তো অতখানি বলতে হবে না! 'বিশ্বস্ত তুমি'—এই পর্যন্ত বলে তুমি থেমে যাবে। তারপর পিরেমাস আবার ঢুকে কথা কইলে তার জবাবে আবার তুমি বলবে—'হে সুন্দরী ইহুদী' ইত্যাদি ইত্যাদি—"

"ওঃ, তাই বটে!"—ফ্লুট নতুন আবৃত্তি করল—"ঘোড়ার মত পরিশ্রমী আর বিশ্বস্ত তুমি—"

এই সময়ে তাঁতী বটম ফিরে এল। কিন্তু—

এ কী আশ্চর্য! কী ভয়ানক! এর মানেটা কী?

তাঁতী বটমের মাথাটা গাধার মাথা হয়ে গেছে!

এ কী জাদু? না, ভৌতিক কাণ্ড?—নাটুকে দলের সবাই ভয় পেয়ে পালাল।

আসলে ব্যাপারটা আর কিছুই নয়, পক একটা মজা করেছে তাঁতী বটমের সঙ্গে। সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নাটকের মহড়া শুনছিল, তারপর একটু মজা করবার জন্য শব্দ করলে যেই তাঁতী বটম তার দিকে এগিয়ে এসেছে, অমনি বটমের মাথার উপরে একটি গাধার মাথা এমন পরিপাটি করে বসিয়ে দিয়েছে যে তাঁতী বটমের নিজের মাথা আর চোখেই পড়ছে না কারুর।

দলের সবাই কেন যে তাকে দেখে ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল, তা কিন্তু তাঁতী বটম বুঝতে পারলে না। কী করে পারবে? সে তো আর টের পায়নি যে তার মাথার উপরে একটা গাধার মাথা গজিয়ে উঠেছে হঠাৎ! বন্ধুরা দেখে পালিয়েছে, এটাকে সে শুধু ওদের বজ্জাতি বলেই মনে করল।

সে মনে মনে বলল—"ওরা আমাকে একা ফেলে পালিয়েছে, ভেবেছে রাতে বনের ভিতর আমি ভয় পেয়ে মরব। আচ্ছা! আমিও ভয় পাবার পাত্রই নয়!" এই বলে সে সেখানেই নরম ঘাসে আরামে শুয়ে গান ভাঁজতে আরম্ভ করল।

নিকটেই একটি ফুলের বিছানায় ঘুমোচ্ছিলেন রানী টাইটানিয়া। বটমের গানের বহরে তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। চোখ মেলেই তিনি দেখলেন—তাঁর সামনেই মাটিতে শুয়ে আছে একজন পুরুষ। 'অলস-প্রণয়' ফুলের রস তখন তাঁর চোখে মাখানো। সেই ফুলের গুণে বটমকে দেখেই টাইটানিয়ার বেজায় ভাল লেগে গেল। তার গাধার মাথাটা টাইটানিয়ার মনে হলো অপরূপ সুন্দর। তিনি উঠে এসে বটমের কাছে প্রেম নিবেদন করতে লাগলেন। সখীদের ডেকে তিনি আদেশ করলেন—নানাভাবে বটমের মনটা খুশী করবার জন্য। বটম তাদের সেবার বহর দেখে অবাক্ হয়ে গেল।

টাইটানিয়া যখন বটমকে নিয়ে পাগল, তখন পক গিয়ে রাজা ওবেরনকে ব্যাপারটা জানাল। ওদিকে ওবেরনের সামনে তখন চলছে ডেমিট্রিয়াসের সঙ্গে হার্মিয়ার কথা কাটাকাটি।

কিছুক্ষণ আগে ডেমিট্রিয়াসের সঙ্গে হার্মিয়ার সেখানেই দেখা হয়েছিল। হার্মিয়া লাইসাণ্ডারের খোঁজে তখন পাগলিনী প্রায়। ডেমি-

ট্রিয়াসকে সে যা-নয়-তাই বলে ধিক্কার দিতে লাগল, আর কেঁদে কেঁদে বলতে লাগল লাইসাণ্ডারকে ফিরিয়ে দিতে। ডেমিট্রিয়াস কিন্তু একটুও টলল না। সে হার্মিয়াকে ছেড়ে দিয়ে লাইসাণ্ডারের খোঁজে চলল। লাইসাণ্ডারকে কৌশলে হত্যা করতে না পারলে সে হার্মিয়ার মন তার দিকে কিছুতেই ফেরাতে পারবে না।

ওবেরন বুঝতে পারলেন যে তাঁর সামনের ওই যুবকটির চোখে 'অলস-প্রণয়' ফুলের রস মাখিয়ে দেবার জন্য পককে যে আদেশ দিয়েছিলেন, তা পালন করা হয় নি। তিনি পককে ডেকে পাঠালেন।

এদিকে হার্মিয়া দেখে ফেলেছে যে লাইসাণ্ডার হেলেনার পিছনে পিছনে ছুটতে ছুটতে ভালবাসার দোহাই পাড়ছে। এ দেখে মনটা জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে তার। লাইসাণ্ডারকে সে জিজ্ঞাসা করে, "এ তোমার হল কি? আমি কী অপরাধ করেছি তোমার কাছে? আর, আমি যদি কোন অপরাধ করেই থাকি, আমায় তুমি বকতে পার, মারতে পার; কিন্তু তা বলে আমাকে বেমালুম ভুলে গিয়ে চোখের পলকে হেলেনাকে ভালবেসে ফেললে কেমন করে? আমি যে তোমারই জন্য ডিউকের কাছে থেকে মৃত্যুদণ্ড নিতে রাজী ছিলুম।"

তবুও লাইসাণ্ডার হার্মিয়ার দিকে ফিরেও তাকাল না। পাগলের মত সে হেলেনার পিছনে পিছনে ছুটল। আর লাইসাণ্ডারের পিছনে ছুটল হার্মিয়া। লাইসাণ্ডারের মেজাজ বিগড়ে যাওয়ার দরুন হার্মিয়া ও হেলেনা দুজনেই বিপন্ন হল।

এই অবস্থাটিও ওবেরনের চোখে পড়ল। পক আসতেই তিনি তাকে ভয়ানক বকাবকি করতে লাগলেন। লোক ভুল করে হতভাগাটা দারুণ গোলমাল ঘটিয়ে বসেছে। পক চাইল ভুলটা শুধরে নিতে, কিন্তু তা করার যে কোন উপায়ই এখন নেই। লাইসাণ্ডার ও ডেমিট্রিয়াস আবার ঘুমিয়ে না পড়লে কিছুই যে করতে পারা যাবে না! ঠিক হল যে ডেমিট্রিয়াসের চোখে 'অলস-প্রণয়' ফুলের রস মাখিয়ে ভুলটা শুধরে নেবার চেষ্টা করতে হবে।

এতক্ষণে ডেমিট্রিয়াস পরিশ্রান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল বনের এক নিরিবিলি জায়গায়। তখন ওবেরন সেখানে নিজে এসে তার চোখে 'অলস-প্রণয়' ফুলের রস মাখিয়ে দিলেন। কিছুক্ষণ বাদে ছুটতে ছুটতে সেখানে এসে পড়ল হেলেনা।

ডেমিট্রিয়াস জেগে উঠে তাকে দেখতে পেয়েই আকুলভাবে তাকে ভালোবাসার কথা বলতে লাগল। হেলেনা স্বাভাবিক অবস্থায় ডেমিট্রিয়াসের মুখে এর অর্ধেক আদর পেলে স্বর্গ হাতে পেত, কিন্তু লাইসাণ্ডারের একটু আগেকার আচরণ দেখে এদের সবাইয়ের উপরই তার এখন সন্দেহ হচ্ছে। তার মনে হল—তাকে নিয়ে একটা হাসাহাসি করবার জন্য লাইসাণ্ডার, ডেমিট্রিয়াস আর হার্মিয়া সবাই মিলে করেছে একটা হীন চক্রান্ত। এই ধারণার বশে সে নিজের ভালবাসার মানুষ ডেমিট্রিয়াসের কথাগুলোকে আন্তরিক বলে মনে করতে পারল না। ডেমিট্রিয়াসকে তিরস্কার করে সে পালিয়ে গেল বনের অন্য দিকে।

ততক্ষণে লাইসাণ্ডার আর হার্মিয়াও সেখানে এসে পড়েছে। ডেমিট্রিয়াস হেলেনাকে ভালবাসার কথা বলছে শুনে লাইসাণ্ডার তাকে শত্রু মনে করল, এবং তাকে আহ্বান করল লড়াইয়ে। তরোয়াল খুলে দুজনে দুজনকে আক্রমণ করতে যায় আর কি!

আড়াল থেকে পক এই সব কাণ্ড দেখে এতক্ষণ খুব হাসছিল। এখন সে দেখল মহাবিপদ। লড়াইয়ে যদি কোন একজন মারা পড়ে, তবে ওবেরন তাকেই দোষী করবেন। লড়াই থামিয়ে দেবার জন্য সে জাদু মন্তরে তখনি জোছনা রাতকে আঁধার করে ফেলল—এমন নিবিড় আঁধার যে কেউ আর কাউকে চোখে দেখতে পায় না। সেই আঁধারের আড়াল থেকে পক কখনো লাইসাণ্ডারের মত গলার আওয়াজ বার করে ডেমিট্রিয়াসকে ডাকতে লাগল, আবার কখনো ডেমিট্রিয়াসের মত গলার আওয়াজ করে শাসাতে লাগল লাইসাণ্ডারকে। ফলে পকের আওয়াজ লক্ষ্য করে ডেমিট্রিয়াস চলে গেল বনের একদিকে, লাইসাণ্ডার বনের অন্যদিকে। তারপর পক নীরব হয়ে গেল। লাইসাণ্ডার ও ডেমিট্রিয়াস সারা বন হাতড়ে ফিরতে লাগল একজন আর একজনকে খুঁজে খুঁজে।

অবশেষে দারুণ হয়রান হয়ে শেষরাতে ওরা যে-যেখানে ছিল সেখানেই ঘুমিয়ে পড়ল আবার।

ওবেরন এই সুযোগেরই জন্য যেন অপেক্ষা করছিলেন। 'অলস-প্রণয়' ফুলের মোহ কাটিয়ে দেবার ওষুধ ছিল অন্য একটা ফুলের রস। ওবেরন সেটা জানতেন, তাই টাইটানিয়ার চোখে যথাকালে মাখিয়ে দেবার জন্য সে-রসও তিনি জোগাড় করে রেখেছিলেন। এখন ঘুমন্ত লাইসাণ্ডারের চোখে সেই রস তিনি মাখিয়ে দিলেন।

ফলে, এবার ঘুম ভেঙ্গে লাইসাণ্ডার যখন উঠল, তখন তার মন থেকে হেলেনার উপর সেই এক দণ্ডের ভালবাসা একেবারেই কেটে গেছে। হার্মিয়ার জন্য সে আবার ব্যাকুল হয়ে উঠল, এবং হার্মিয়াকে খুঁজে বার করে তার কাছে ক্ষমা চাইল। তখুনি আবার দুজনের ভিতর আগেকার সেই শান্তি ও প্রীতি ফিরে এল নতুন হয়ে।

আর ডেমিট্রিয়াসকে 'অলস-প্রণয়' ফুলের মোহ কাটাবার ওষুধ তো ওবেরন দেননি! কাজেই হেলেনার উপর তার মোহ রয়েই গেল। লাইসাণ্ডার ও হার্মিয়ার মধ্যে আবার আগেকার ভালোবাসার জোয়ার এসেছে দেখে ডেমিট্রিয়াসের ভালবাসাকে এবার হেলেনা সরল ভাবেই নিতে পারল। ডেমিট্রিয়াস ও হেলেনার মধ্যে নিখুঁত ভালোবাসা গড়ে উঠল এরপর থেকে।

* * *

ওদিকে তাঁতী বটমকে নিয়ে রানী টাইটানিয়ার পাগলামি চরমে উঠেছে। বটমের গাধার মাথাটা কোলে নিয়ে টাইটানিয়া তাকে মধুর স্বরে প্রেমের কথা শোনাচ্ছেন, তখন ওবেরন গিয়ে সেখানে হাজির হলেন। রানী তাঁকে দেখে ঘুমের ভাণ করলে সেই অবসরে ওবেরন তাঁর চোখে মাখিয়ে দিলেন 'অলস-প্রণয়' ফুলের মোহ কাটাবার ওষুধ।

মোহ কেটে যেতেই বটমের গাধার মুণ্ড দেখে ঘৃণায় দূরে সরে গেলেন টাইটানিয়া, আর নিজের আচরণের জন্য ওবেরনের কাছে ক্ষমা চাইতে লাগলেন। ওবেরন বললেন, "ক্ষমা পেতে হলে সেই সুন্দর মানুষের ছেলেটিকে আমায় দিতে হবে। আর তা যদি না দাও, আমি তোমায় ত্যাগ করে রটিয়ে দেব যে তোমার স্বভাব চরিত্র খারাপ—স্বামী থাকতে তুমি অন্যকে ভালবাসো। তখন ত্রিভুবনে তোমার লজ্জার সীমা থাকবে না।"

নিরুপায় হয়ে রানী টাইটানিয়া ছেলেটিকে স্বামীর হাতে তুলে দিলেন। পরীর দলে শান্তি ফিরে এল আবার।

সেই সময় তাঁতী বটমের মাথা থেকে গাধার মুণ্ডটা টেনে খুলে নিল পক। তাঁতী বটম এবার নিজের বুদ্ধি-সুদ্ধি ফিরে পেয়ে বন্ধুদের খুঁজতে গেল। তার মনে হতে লাগল—ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সে অতি অদ্ভুত সব স্বপ্ন দেখেছে!

রাত শেষ হল!



সিবাস্টিয়ান অপরিচিতা সুন্দরীর মুখে প্রণয় সম্ভাষণ শুনে
বিস্মিত ও আনন্দিত হলেন।

ডিউক থিসিউস্ সকালে সেই বনে এসেছেন মৃগয়া করতে। ইজিউসও এসেছেন নিজের বাড়ি-পালানো মেয়েটাকে খুঁজতে।

শুধু নিজের মেয়েকেই নয়, ডেমিট্রিয়াস, লাইসাণ্ডার, হেলেনা ও আরও অনেককেই ইজিউস দেখতে পেলেন সেই বনে। সবচেয়ে অবাক হলেন তিনি ডেমিট্রিয়াসের আচরণে। সে তাঁকে স্পষ্টই বলল, "আমি আর হার্মিয়াকে বিয়ে করতে চাই না; আপনি লাইসাণ্ডারের সাথেই ওর বিয়ে দিন। আমি হেলেনাকে বিয়ে করব।" নিরুপায় ইজিউস সেকথায় রাজী হয়ে গেলেন। তিনি তখনি লাইসাণ্ডার ও হার্মিয়াকে ডেকে তাদের বিয়েতে নিজের আর কোন আপত্তি নেই বলে জানিয়ে দিলেন।

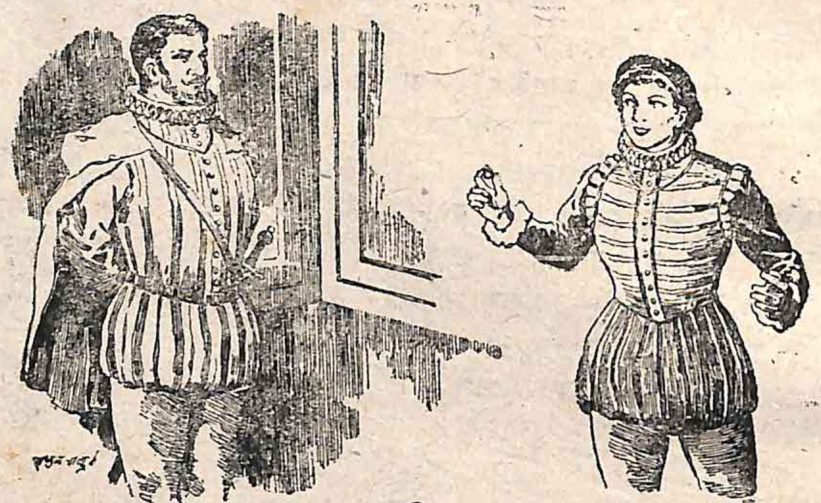
সব অশান্তি দূর হয়ে গেল। থিসিউস খুশী হয়ে বললেন, "তাহলে তিনটে বিয়েই একদিনে হয়ে যাক্। আমার সঙ্গে হিপোলিটার, ডেমিট্রিয়াসের সঙ্গে হেলেনার এবং লাইসাণ্ডারের সঙ্গে হার্মিয়ার!"

ওদিকে তাঁতী বটমকে ভূতে ধরে নিয়ে গেছে মনে করে নাটুকে দল অভিনয়ের মতলব ছেড়ে হতাশ হয়ে বসেছিল, হঠাৎ তাঁতী বটম সুস্থ শরীরে তাদের কাছে গিয়ে হাজির। তাকে দেখে আনন্দের তুফান ছুটল, দ্বিগুণ উৎসাহে আবার শুরু হল অভিনয়ের তোড়জোড়।

বিয়ের রাতে তিনজোড়া নতুন স্বামী-স্ত্রীর সামনে 'পিরেমাস্ ও থিস্‌বি' নাটকের অভিনয় করল তাঁতী বটমের দল। অভিনয়ে তাদের যতই খুঁত থাক, তাদের রাজভক্তির ভিতরে খুঁত ছিল না একটুও।

তাদের নাটকের পালা ভাঙলে সেখানেই বসল পরীদের নাচ-গানের আসর। হার্মিয়া-হেলেনার প্রণয় ব্যাপারের জট যে তারাই ভেঙে দিয়েছে, তা হার্মিয়ারা না জানুক, তারা তো জানে; তাই মানুষের চোখের আড়ালে থেকেও, তাদের বিয়েতে যোগ দিয়ে আনন্দ করবার লোভ তাদের হতে পারে বইকি!

———



টুয়েলফ্‌থ নাইট

সিবাস্টিয়ান নামে মেসালিনার অধিবাসী এক যুবক তার বোন ভায়োলাকে নিয়ে জাহাজে চড়ে যাচ্ছিল ইলিরিয়া দেশের উপকূলের কাছ দিয়ে। সে-সময় প্রচণ্ড ঝড়ের দাপটে জাহাজডুবি হওয়ার উপক্রম হল।

জাহাজের ক্যাপ্টেন যথাসাধ্য চেষ্টা করেও জাহাজটাকে রক্ষা করতে পারলেন না। তাঁর চোখের সামনেই অনেকে জলের তোড়ে মাঝ দরিয়ায় ভেসে গেল। সবশেষে সিবাস্টিয়ানকেও জলের তোড়ে ভেসে যেতে দেখে জাহাজের ক্যাপ্টেন তার দিকে মাস্তুলের ভারী শক্ত কাঠের গুঁড়ি এগিয়ে দিলেন। সিবাস্টিয়ান সেই কাঠের গুঁড়ির সাহায্যে ভাসতে লাগল সাগরের বুকে। একটা ছোট নৌকার সাহায্যে কয়েকজনের প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা করলেন ক্যাপ্টেন। কিন্তু অতি অল্প কয়েকজন বাঁচল, বেশীর ভাগ লোকই প্রাণ হারাল। যে অল্প কয়েকজনের প্রাণ বাঁচাতে পেরেছিলেন জাহাজের ক্যাপ্টেন, তাদের মধ্যে ভায়োলা ছিল একজন।

সিবাস্টিয়ান ও ভায়োলা ছিল দুই যমজ ভাই-বোন। তারা দুজনে একই সঙ্গে জন্মগ্রহণ করেছে, আর যমজ বলেই ওদের চেহারায় এত বেশী মিল যে দুজনকে একরকম পোশাক পরিয়ে দিলে, কোন্‌টি সিবাস্টিয়ান

আর কোন্‌টি ভায়োলা, কারও পক্ষে তা সহজে চিনে বার করা সম্ভব ছিল না। বয়স তাদের কম, এই সবে তারা যৌবনে পা দিয়েছে।

ইলিরিয়ায় পৌঁছে জাহাজের ক্যাপ্টেন জানতে চাইলেন—ভায়োলা এখন কি করবে? কোথায় সে যেতে চায়?

ভায়োলা তখন ভাইয়ের বিচ্ছেদে শোকাতুর। ভাইয়ের কথা ছাড়া আর কিছুই সে ভাবতে পারছে না। ক্যাপ্টেন তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন যে, তার ভাই মাস্তুলের শক্ত কাঠের গুঁড়ি ধরে ভেসে গেছে। এরকম অবস্থায় শেষ পর্যন্ত বেঁচে ফিরে আসতেও তো পারে আর তখন তার সাথে দেখা হবেই হবে। এই বলে ক্যাপ্টেন তাঁর পূর্ব অভিজ্ঞতার কয়েকটা উদাহরণ দিয়ে এমনভাবে ভায়োলাকে বোঝাতে লাগলেন যে তার ভাই যেন সত্যসত্যই বেঁচে ঘরে ফিরে আসবে।

ক্যাপ্টেনের এইসব সদয় কথায় ভায়োলা ধীরে ধীরে শান্ত হল। সে এবার ভাবতে বসল,—কোথায় সে যাবে? কিই বা করবে এবার? এখন টাকাকড়ি নেই তার কাছে। এই সুদূর বিদেশে তাকে সাহায্য করারও কেউ নেই। একমাত্র ভাই ছিল তার ভরসা—সেও হয়তো আর বেঁচে নেই। আর যদি বেঁচেই থাকে তো কবে দেখা হবে তারও ঠিক নেই।

নিজেকে রোজগার করেই এখন খেতে হবে। মেসালিনা ফিরে যাওয়ার খরচ তাকে নিজের চেষ্টাতেই যোগাড় করতে হবে। চাকরিই খুঁজতে হবে তাকে। কিন্তু এই অজানা অচেনা দেশে চাকরিই বা তাকে দেবে কে, আর সেই বা ভাল করে না জেনে শুনে কার কাছে চাকরি করতে যাবে কোন্‌ সাহসে? হাজার হোক্‌, সে তো একজন যুবতী মেয়েছেলে। এদিক দিয়েও তো তার বিপদ আছে?

অনেক সাত-পাঁচ ভেবে ভায়োলা ক্যাপ্টেনের কাছে প্রথম ইলিরিয়ার লোকেদের সাধারণ খোঁজখবর করল। ক্যাপ্টেন ছিলেন ইলিরিয়ার কাছাকাছি কোন এক জায়গার স্থায়ী বাসিন্দা। তাই তিনি এখানকার অনেক খোঁজখবর রাখতেন।

ভায়োলার প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন যে ইলিরিয়ার ডিউক অর্সিনো একজন অতি সৎলোক, বিনয়ী ও ভদ্র। তাঁকে এখানকার সকলেই ভালবাসে, তবে তিনি যে মেয়েটিকে ভালবাসেন, সে তাঁকে বিয়ে করতে চাইছে না বলে তিনি এখন খুবই মুষড়ে পড়েছেন।

ভায়োলা তখন ওই মেয়েটির কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করল। ক্যাপ্টেন তাকে জানালেন যে, সেই মেয়েটি অতি উচ্চ সম্ভ্রান্ত ঘরের—তার নাম অলিভিয়া। মেয়েটির বাপ-মা বেঁচে নেই, আর একটি মাত্র ভাই ছিল কিন্তু তার আকস্মিক মৃত্যুতে মেয়েটি এতই শোকাতুরা হয়ে পড়েছে যে, সে বিয়ে করার কথা চিন্তাও করে না। তাই ডিউক অর্সিনোকে সে মোটেই আমল দিচ্ছে না, এমনকি সে ডিউকের সঙ্গে পর্যন্ত তার দেখাসাক্ষাৎ বন্ধ করে দিয়েছে, আর তাঁর পাঠানো লোককেও তার কাছে ঘেঁষতে দেয় না!

সব শুনে ভায়োলা ঠিক করল যে, সে ওই অলিভিয়ার কাছে আশ্রয় নেবার চেষ্টা করবে। সেও তো নিজের একমাত্র ভাইয়ের জন্য ম্রিয়মাণ। ভাইয়ের শোকে কাতর অলিভিয়ার কাছে থাকতে পেলে সেও সমব্যথী হয়ে তাকে সান্ত্বনা দেবে, আর নিজেও সান্ত্বনা লাভ করবে।

ক্যাপ্টেনের কাছে ভায়োলা তার মনের ইচ্ছাটা প্রকাশ করলে তিনি জোর দিয়েই বললেন যে অলিভিয়ার সাথে দেখাসাক্ষাৎ করা কোনমতেই সম্ভব নয়, তাই সেখানে চাকরি পাওয়ার কোন আশা নেই।

এবার ভায়োলা মহা ভাবনায় পড়ল। হঠাৎ একটা মতলব তার মাথায় এল। সে ভাবছিল যে ডিউক অর্সিনোর কাছে চাকরি নিলে সবদিক থেকে রক্ষা হয়! ডিউক যে একজন সদাশয় ভদ্রলোক একথা সে নিজের দেশে থাকতেই অনেকদিন আগে শুনেছে, আর ক্যাপ্টেনও সেই কথাই এখন বলছেন। তাঁর কাছে চাকরি ও আশ্রয় নেওয়াই সবচেয়ে নিরাপদ। কিন্তু যুবতী মেয়ে হয়ে অবিবাহিত ডিউকের কাছে কি ধরনের চাকরি নেবে! অনেক ভেবেচিন্তে সে ঠিক করল যে পুরুষের বেশে সজ্জিত হয়ে সে ডিউকের ভৃত্য হবার চেষ্টা করবে।

ক্যাপ্টেনকে সে নিজের মনের কথা খুলে বলল। তিনি এতে আপত্তির কোন কারণ দেখতে পেলেন না। সত্যিই তো, এই বিদেশে অজানা অচেনা জায়গায় এই যুবতী মেয়েটি কোথায় যাবে, কার কাছেই বা থাকবে? তিনিও এতক্ষণ ভায়োলার কথাই ভাবছিলেন। তাকে যখন প্রাণে বাঁচিয়েছেন, তখন তার একটা নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে না দিয়েই তিনি এখান থেকে চলে যাবেন কি করে? অথচ তাঁর জাহাজডুবি হয়েছে বলে তিনি এখানে একদণ্ডও চুপ করে বসে থাকতে পারেন না।

এখন ভায়োলার প্রস্তাবে তাঁর চিন্তার অবসান ঘটল। তিনি সানন্দে

তার কথায় রাজী হয়ে তাকে ডিউকের কাছে পৌঁছে দিতে রাজী হলেন। ডিউককে তিনি ভাল করেই চেনেন। তাঁর অনুরোধ হয়ত ডিউক ঠেলে ফেলতে পারবেন না।

ভায়োলার বহুদিনের ইচ্ছা ছিল তার ভাইয়ের মতই একই রংয়ের ও ও একই ধরনের একপ্রস্থ পুরুষের পোশাক পরবার। কিন্তু নিজে মেয়ে হয়ে সেটা এতদিন করতে পারেনি। তাই এবার সুযোগ এসে যাওয়ায় ভায়োলা ক্যাপ্টেনকে জানাল, তার কি ধরনের পোশাক চাই, তার রংই বা কি রকম হবে। ক্যাপ্টেন তার কথামত ঠিক মাপের পুরুষের পোশাক কিনে আনিয়ে দিলেন।

পুরুষের পোশাক পরার পর ক্যাপ্টেন ভায়োলাকে নিয়ে ডিউক অর্সিনোর দরবারে হাজির হলেন। ক্যাপ্টেন ডিউককে জাহাজডুবির কথা জানিয়ে তাঁর সঙ্গের ছেলেটিকে একটি চাকরি দেবার অনুরোধ করলেন—ছেলেটির নাম বললেন সিজারিও।

সুন্দর চেহারার জয় সব জায়গায়। পুরুষবেশে অতি চমৎকার দেখাচ্ছিল ভায়োলাকে। সৌম্যদর্শন কিশোর ছেলেটিকে প্রথম দৃষ্টিতেই কেমন যেন ভালবেসে ফেললেন ডিউক। তাই অচেনা হলেও অর্সিনো কিশোরটিকে আশ্রয় ও চাকরি দিতে আপত্তি করলেন না। সিজারিওকে নিজের পাশে পাশেই রাখলেন ছোটখাট কাজ করবার জন্য।

ডিউক অর্সিনো বহুদিন থেকেই অপূর্ব সুন্দরী যুবতী কাউন্টেস্ অলিভিয়াকে বিয়ে করতে চাইছেন; কিন্তু অলিভিয়া বার বার অসম্মতি জানিয়েছেন অর্সিনোর প্রস্তাবে, তাঁকে স্বামীরূপে বরণ করতে একান্তই অরাজী। তবু অর্সিনো এখনও হাল ছাড়েননি। এবার সুদর্শন ও সৌম্য কিশোর সিজারিওকে পেয়ে ভাবলেন যে তাকে অলিভিয়ার কাছে পাঠিয়ে একবার শেষ চেষ্টা করতে হবে। তাঁর বিশ্বাস, অলিভিয়া তাঁর পাঠানো অন্য লোকদের কড়া কথায় বিদায় করলেও সিজারিওকে সহজে বিমুখ করতে পারবেন না। কারণ সিজারিওর চেহারার একটা মুগ্ধ আকর্ষণ আছে। তাই ডিউক অর্সিনো ভায়োলাকে পাঠালেন অলিভিয়ার কাছে তাঁর প্রেমের দূত হয়ে। পাঠাবার আগে অর্সিনো অলিভিয়ার সঙ্গে নিজের হৃদয়ের গোপন প্রেমের ব্যাপারটা খোলাখুলি ভাল করে সিজারিওকে বুঝিয়ে দিলেন, আর শিখিয়ে দিলেন—কিভাবে কী কথা বলতে হবে নিষ্ঠুর অলিভিয়ার কাছে।

কী বরাতের ফের বেচারী ভায়োলার !

এদিকে প্রথম দর্শনেই ভায়োলা ডিউক অর্সিনোকে ভালবেসে ফেলেছে। কোনদিন অর্সিনোকে পতিরূপে লাভ করবার আশা তার নেই, কিন্তু মন তার বোঝে কই ! চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে ডিউকের প্রতি ভায়োলার অনুরাগ দিনদিন আরও প্রবল হয়ে উঠছে। তাঁর সঙ্গে না হোক তার বিয়ে, ভালবাসার লোকের কাছে কাছে থাকতেও তো আনন্দ আছে ! তাই ডিউকের আদেশ পালন করে, যতটুকু সাধ্য তাঁর সেবা করে তাঁর মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলতে পারলেই ভায়োলা যেন তৃপ্তি পায় !

অর্সিনো ভায়োলাকে বলেছেন, অলিভিয়াকে মধুর ভাষায় তাঁর হয়ে অনুনয় করে বলতে হবে—'অয়ি রূপসি ! তুমি আমার মনিবের উপর দয়া কর !' ভায়োলার পক্ষে যে এ ধরনের অনুনয় করা একান্তই কঠিন তা অলিভিয়াও বুঝবেন না, অর্সিনোও জানবেন না। তাছাড়া সে যে নিজেই ডিউক অর্সিনোকে গভীরভাবে ভালবেসেছে। মুখ ফুটে শুধু তাঁকে নিজের পরিচয় দিয়ে তা বলতে পারে নি, হয় ত বা বলতে পারবে না কোন দিন। চোখ ফেটে জল বেরোতে চায়, তা দমন করে মুখে হাসি ফোটাতে হল ভায়োলাকে। হাসিমুখেই যেতে হল তাকে অলিভিয়ার কাছে। রওনা হবার মুখে ডিউক তাকে বারবার মনে করিয়ে দিলেন, অলিভিয়ার মন গলানোর জন্য কিভাবে কথা কইতে হবে।

অর্সিনো যখন ভায়োলাকে এসব বোঝাচ্ছেন, তখন অলিভিয়ার কাছে তাঁর আগের পাঠানো একজন লোক এসে তাঁকে জানাল যে সে বহু চেষ্টা করেও অলিভিয়ার সঙ্গে দেখা করতে পারেনি, তবে অলিভিয়া বলে পাঠিয়েছেন যে ডিউক যেন আর কোনদিন কাউকেই না পাঠান, কেন না তিনি আর নিজের মুখ কাউকেই দেখাবেন না এবং ভাইয়ের শোকে সাতবছর ধরে নিজের মুখ ঢেকে রেখে সন্ন্যাসিনীর মত জীবন কাটাবেন, আর মৃত ভাইয়ের স্মরণে তাঁর চোখের জলে ঘর ভাসিয়ে দেবেন। এখন বিয়ের চিন্তাই তাঁর কাছে অসহ্য !

একথা শোনার পর ভায়োলাকে অর্সিনো বলে দিলেন, "অলিভিয়ার এসব ওজরে তুমি মোটেই কান দিও না। স্পষ্ট বলে পাঠাবে—'যতক্ষণ দেখা না পাচ্ছি—ফিরব না কিছুতেই। দুচারদিন যদি অনাহারেও পড়ে থাকতে হয় বাড়ির দরজায়, তাও আমি থাকব।'—মোটের উপর দেখা না করে ফিরে আসবে না কোনমতেই।"

এরপর ভায়োলা অলিভিয়ার বাড়ির দিকে রওনা হল।

* * *

অলিভিয়ার বাড়ির নীচের তলায় বাস করেন সার টোবি ও সার আন্‌ড্রু। দুজনেই বড় ঘরের ছেলে, অবিবাহিত ও মাতাল। তাঁরা পরস্পরের বন্ধু। সার টোবি হচ্ছেন অলিভিয়ার দূর সম্পর্কের খুড়ো, তাই এ বাড়িতে বাস করার খানিকটা অধিকার আছে বলে মনে করেন।

অলিভিয়ার বিয়ে-থাওয়ার ব্যাপারেও সার টোবি নাক গলাতে চান, কিন্তু এ বিষয়ে অলিভিয়া স্পষ্টই আপত্তি করেছে। সার টোবির ইচ্ছা—অলিভিয়ার সঙ্গে তাঁর বন্ধু সার আন্‌ড্রুর বিয়ে হোক্। অলিভিয়ার সঙ্গে বিয়েটা ঘটিয়ে দেবে, এই আশা দিয়ে তিনি সার আন্‌ড্রুকে এ বাড়িতে এনেছেন, আর সার আনড্রু সেই আশায় এ বাড়িতে থেকে নিজের গাঁটের পয়সা আঁচল খরচ করে সার টোবিকে দিনরাত মদ খাওয়াচ্ছেন আর দুজনে মাতলামি করছেন।

কিন্তু মাতলামি করলে কি হয়, তাঁদের চোখ আছে বাড়ির সদর-দরজার দিকে আর অলিভিয়ার উপর। তাঁরা নজর রাখেন—অলিভিয়ার সাথে কে কিজন্য দেখা করতে আসে। তাঁদের উদ্দেশ্য—অলিভিয়াকে যে বিয়ে করতে চাইবে, তাকে ছলে বলে কৌশলে, এমনকি জোর জবরদস্তি করে ভাগিয়ে দেওয়া—যাতে সার আন্‌ড্রুকে বিয়ে করা ছাড়া অলিভিয়ার অন্য কোন উপায় থাকবে না।

ডিউকের লোক যে প্রায়ই অলিভিয়ার সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করে থাকে, আর কেনই বা করে তাও তাঁদের অজানা নয়। তবে তাঁরা এই জেনে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছেন যে অলিভিয়া ডিউককে কোনমতেই বিয়ে করতে রাজী নন।

অলিভিয়ার বাড়ির সদর দরজাতে যেতেই সিজারিওর সাথে দেখা হল সর্দার গৃহভৃত্যের—তার নাম ম্যালভোলিও। অর্সিনো যে গৃহকর্ত্রীর কাছে প্রায়ই প্রেমের নিবেদন পাঠান লোক মারফত, সে-কথা ম্যালভোলিও ভাল করেই জানত। তার গৃহকর্ত্রী ডিউককে বিয়ে করতে রাজী নন বলে তার উপর কড়া হুকুম দিয়েছেন যে কোন লোক তাঁর সাথে দেখা করতে এলেই যেন সরাসরি তাকে হাঁকিয়ে দেওয়া হয়।

তাই সিজারিওকে দেখা মাত্রই ম্যালভোলিও বলে উঠল, "গৃহকর্ত্রীর সঙ্গে এখন দেখা হবে না। তিনি বড়ই অসুস্থ!"

ভায়োলা জবাব দিল, "তাই শুনেই তো তাঁকে দেখতে এসেছি।"

ম্যালভোলিও বলল, "তিনি এখন ঘুমিয়ে আছেন।"

ভায়োলা নাছোড়বান্দা। তাকে অলিভিয়ার সঙ্গে যেভাবেই হোক দেখা করতেই হবে। একে ডিউক বলেছেন দেখা করতে, তার উপর সে নিজেও দেখতে চায় অলিভিয়ার কি এমন রূপ গুণ আছে—যার জন্য ডিউক এমন ভাবে তার জন্য পাগল হয়ে উঠেছেন।

ভায়োলা জবাব দিল, "সে কথাও আমি তো আগেই জানি, তাই যতক্ষণ না তাঁর দেখা পাই, এখানেই এই দরজার গোড়াতেই অপেক্ষা করব। তাঁর সাথে দেখা না করে আজ আমি কিছুতেই ফিরে যাব না—এই আমার পণ।"

ম্যালভোলিওর মুখে আগন্তুকের ধনুকভাঙ্গা পণের কথা শুনে অলিভিয়া জিজ্ঞাসা করলেন, "লোকটা কী রকম বলতে পার? এরকম আশ্চর্য জিদ্!"

ম্যালভোলিও উত্তর দিল, "ওকে লোক বলি কি করে? লোক বলতে বুঝি বড়-সড় লোককে। ও একটা কিশোর বললেই হয়। মানে, কিশোরও নয়, যুবকও নয়।"

"দেখতে কি রকম?"—আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করলেন অলিভিয়া।

"দেখতে ভালই। খুব বেশী রকমের ভালই বলতে হবে। সাধারণতঃ পুরুষের এত ভাল চেহারাই হয় না।"—উত্তর করল ম্যালভোলিও।

বয়সে কিশোর, অথচ দেখতে খুব বেশী রকমের ভাল, এ ধরনের লোক তো ডিউক আগে কখনো পাঠান নি—তাই আগন্তুককে দেখতে অলিভিয়ার কৌতূহল হল।

একখানা ওড়না টেনে মুখের উপর দিয়ে অলিভিয়া বললেন, "ডিউক নিশ্চয়ই পাঠিয়েছেন ওই কিশোর ছেলেটিকে। তার সাথে দেখা করলে আমার সংকল্প নষ্ট হবে, কিন্তু সে ফিরে যেতেই চাইছে না যখন, নিয়েই এস একবার তাকে এখানে।"

ভায়োলা এল অলিভিয়ার কাছে।

বাস্তবিক কী খেয়ালী এই কানা কামদেব! অর্সিনো এক বছর ধরে যার মন একটুও গলাতে পারেননি, তিনি পুরুষবেশী ভায়োলাকে এক পলক দেখেই মুগ্ধ, পাগল হয়ে গেলেন একেবারে।

মধুর আলাপে ভায়োলার সঙ্গে কথা হল অলিভিয়ার। সে আসবার

আগে ওড়নায় মুখ ঢেকেছিলেন তিনি। এখন ভায়োলার সামান্য অনুরোধেই সে-ওড়না ফেলে দিলেন তিনি—ভুলে গেলেন সাতবছর ধরে মুখ ঢেকে রাখবার তাঁর সংকল্প! অর্সিনোর তরফ থেকে যা-কিছু বলার, তা বলতে থাকল ভায়োলা। সেসব একঘেয়ে কথায় অলিভিয়া কান দিলেন না মোটেই। তাঁর চোখ তখন অনিন্দ্যসুন্দর কিশোর সিজারিওর রূপকে যেন গিলে খাচ্ছে! নিজেকে যেন আর সামলাতে পারছেন না!

শেষে তিনি লজ্জিত হয়ে ভায়োলাকে বললেন, "তোমার কাছ থেকে তোমার মনিবের কোন কথাই শুনতে চাই না; তবে তুমি যদি আমার কাছে আসতে চাও, যখন ইচ্ছা আসতে পার।"

"এমনি এমনি আর এসে কি হবে!"—বলে ভায়োলা বিদায় চাইল।

এত তাড়াতাড়ি সিজারিওকে বিদায় দিতে চাইলেন না অলিভিয়া। তিনি যে চোখের দেখাতেই কিশোরটিকে বড় বেশী ভালবেসে ফেলেছেন! তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার বংশ-পরিচয় কি?"

ভায়োলা জবাব দিল, "আমার এখনকার অবস্থার চেয়ে আমার বংশের ইতিহাস আরো ভালো। তাছাড়া, সবচেয়ে বড় কথা আমি একজন ভদ্রলোক।"

আর কথা না বাড়িয়ে ভায়োলা রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল বাড়ি ফেরার জন্য।

অলিভিয়াও নিজের হাতের আংটি খুলে নিয়ে তাড়াতাড়ি ম্যালভোলিওকে ডেকে বললেন, "যাও তো ছুটে ঐ কিশোরটার পিছনে। এই আংটি ও ফেলে গেছে। এটা দিয়ে এসো তাকে।"

ম্যালভোলিও ছুটে গিয়ে রাস্তায় ভায়োলাকে পাকড়াও করল। ভায়োলা তো অবাক্! এ কী ব্যাপার! এ-ভৃত্যটা বলে কী? এ আংটি তো তার নয়! সে তো কোন আংটি ফেলে আসেনি!

কিন্তু সে-কথা ম্যালভোলিও বিশ্বাস করে না! তার ধারণা, অর্সিনোর আদেশেই এ-ছোকরা অলক্ষ্যে তাঁর আংটি ফেলে রেখে এসেছে গৃহকর্ত্রীর কাছে। সে ভায়োলার সামনে আংটি ফেলে দিয়ে বাড়ি ফিরে এল। ফিরতি মুখে বলে এল, "আংটি নিতে হয় নাও। না নাও যদি, পড়ে থাক এটা রাস্তায়। যে পাবে—কুড়িয়ে নেবে।"

অগত্যা ভায়োলাই তুলে নিল আংটিটা। অলিভিয়ার মতই সে নিজেও একজন যুবতী মেয়ে—বুঝতে তার আর কিছুই বাকি নেই। ছিঃ! ছিঃ!

এরকমটা হবে একথা সে যে আগে ভাবতেই পারেনি! অলিভিয়ার এই পাগলামির কথা অর্সিনোর কানে যদি ওঠে? তিনি হয়ত রাগ করে ভায়োলাকে নিজের আশ্রয় থেকে তাড়িয়েই দেবেন। হাসিও পায়, ভয়ও হয়।

* * *

ভায়োলা যতই অনিচ্ছুক হোক, অর্সিনোর আদেশে তাকে আবার অলিভিয়ার কাছে যেতে হল।

এবার অলিভিয়ার বাড়িতে ঢুকতে সদর দরজায় কোন বাধা পেল না ভায়োলা। গৃহকর্ত্রীর হুকুম হয়েছে যে সেই সুদর্শন কিশোরটি যখনই আসবে, তখনই যেন তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

ভায়োলার মুখে আবার অর্সিনোর আকুল আবেদন শুনে অলিভিয়া রেগে উঠে বললেন, "আমি তো তোমায় আগেই বলে দিয়েছি যে ডিউকের কোন কথাই আমি শুনতে চাই না, আর তুমিও যে ডিউকের হয়ে কোন কথা বল তা আমি মোটেই পছন্দ করি না। তবে ডিউক ছাড়া অন্য কেউ যদি আমায় বিয়ে করতে চায় তো তার কথা আমায় বলতে পার।"—এই বলে অলিভিয়া এমনভাবে জবাবের জন্য উৎসুক হয়ে ভায়োলার দিকে তাকিয়ে রইলেন, তাতে ভায়োলা স্পষ্টই বুঝতে পারলো,—অলিভিয়া তাকে পুরুষ ঠাউরে বিয়ে করতে চায়।

ভায়োলা লজ্জায় মাথা নীচু করে রইল। ভায়োলাকে নীরব দেখে অলিভিয়া আবার বললেন, "সিজারিও, তুমি কি ডিউকের ভয় করছ? ডিউককে ভয়ের কোন কারণই নেই। আমি তোমাকে ভালবেসেছি, একথা আর গোপন করে লাভ নেই। তুমি যদি আমাকে বিয়ে কর, ডিউকের সমানই মানী ও ক্ষমতাশালী হবে।"

এ কথা শোনার পর ভায়োলা আর সেখানে একমুহূর্তও দাঁড়াল না। সে কোন জবাব না দিয়েই তাড়াতাড়ি ফিরে এল। শুনতে পেল, অলিভিয়া খানিকটা তার পেছনে পেছনে এগিয়ে এসে বলছেন, "সিজারিও! আমি তোমায় সত্যিই ভালোবাসি, তুমি আবার এসো, আমি তোমার অপেক্ষায় থাকব!"

ভায়োলা দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে খুব তাড়াতাড়ি রাস্তায় বেরিয়েছে, এমন সময়ে পড়ল এক ঘোর বিপদে। স্যার আন্দ্রু সেদিন আড়াল থেকে লক্ষ্য করেছে—সিজারিওর প্রতি অলিভিয়ার অনুরাগ। তাই স্যার

টোবির সঙ্গে পরামর্শ করে সে ঠিক করেছে, সিজারিওর সঙ্গে লড়ে এই সমস্যার মীমাংসা করবে।

ভায়োলাকে রাস্তায় পেয়ে সার টোবি তাকে সাবধান করে দিয়ে বলল যে কিছু দূরে একজন গোঁয়ার লোক তরোয়াল খুলে রক্তখেকো শিকারীর মত তার জন্য অপেক্ষা করছে অন্যায়ের প্রতিশোধ নেবার জন্য—গোঁয়ারটা এর আগে তিন তিনটে খুন করেছে। ভায়োলা এ কথায় ভয় পেয়ে অলিভিয়ার বাড়িতে ফিরে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে সার টোবি বলল, "তা হয় না—তার সাথে লড়াই না করে তুমি সেখানে যেতে পারবে না। লড়াই তোমাকে তার সাথে করতেই হবে। তরোয়াল বার করে এগোও।"

"আমার অপরাধ কি?"—জিজ্ঞাসা করল ভায়োলা।

"ওর কাছে তবে জিজ্ঞাসা করে আসি"—এই বলে সার টোবি আর একজনকে সেখানে দাঁড় করিয়ে রেখে সার আনড্রুকে ডেকে আনল।

সার আনড্রু এসে ভায়োলাকে সোজাসুজি লড়াইয়ে আহ্বান করে বসলেন। ভায়োলা তো রীতিমত ভয় পেয়ে গেল। সে নারী, সে যুদ্ধ করবে কী রকম করে? কিন্তু সার আনড্রু তো সে কথা জানে না, তাই সে নাছোড়বান্দা। খোলা তরোয়াল হাতে সে ভায়োলার দিকে ছুটে গেল। ভায়োলা চিৎকার করে বলতে যাচ্ছিল যে সে একজন নারী, কিন্তু ঠিক এই সময় রাস্তার এক পথিক এসে সার আনড্রুকে তার হয়ে লড়াইয়ে আহ্বান করায় সে থমকে দাঁড়াল।

পথিক ভায়োলাকে দেখিয়ে সার আনড্রুকে বলল, "ও আমার প্রাণের বন্ধু, ওর যদি কোন দোষ থাকে তো সেটা আমি আমার ঘাড়ে নিচ্ছি—ক্ষমতা থাকে তো আমার সঙ্গে লড়ো।"

লড়াই আর দুজনকে করতে হল না। আদালতের লোকেরা ডিউকের পরোয়ানা নিয়ে এসে পথিককে গ্রেফতার করে বসল। পথিকের নাম অ্যান্টোনিও। সে একজন নাবিক। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ যে কয়েক বছর আগে ইলিরিয়াতে অপরাধ করে সে শাস্তি এড়িয়ে বিদেশে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। আজ ডিউকের লোকেরা তাকে ইলিরিয়াতে দেখতে পেয়ে ডিউককে জানালে তাকে গ্রেফতার করবার হুকুম হয়েছে।

গ্রেফতার হবার সঙ্গে সঙ্গে অ্যান্টোনিও ভায়োলাকে বলল, "তোমার জন্যেই আমার এ বিপদটা ঘাড়ে এল। যাই হোক, তোমার কাছে

আমার যা টাকাকড়ি আছে তা আমায় দিয়ে দাও। এখন এই বিপদ্ থেকে মুক্ত হবার জন্য আমার টাকাকড়ির বড়ই দরকার।"

অ্যাণ্টোনিওর কথা শুনে ভায়োলা বিস্মিত হল। সে তাকে কখনো আগে দেখেনি—তার কি পরিচয় তাও সে জানে না। আর টাকাকড়ির কথাটা যে একেবারেই মিথ্যা !

ভায়োলা অ্যাণ্টোনিওকে বলল, "এসব আজগুবি কথা কি বলছেন ? আমি আপনাকে চিনি না, এর আগে আপনাকে কখনও দেখিনি, আর আপনার কোন টাকাকড়িও আমার কাছে নেই। তবে হ্যাঁ, আপনি এই দুজন বদমাশের হাত থেকে আমাকে বাঁচাতে গিয়েছিলেন, তাই আমার কাছে সামান্য যা কিছু আছে, তাই দিয়ে দিচ্ছি।"

একথায় অ্যাণ্টোনিও তো মহা খাপ্পা। সে উপস্থিত সকলকে শুনিয়ে বলতে লাগল, "এই ছোকরাকে আমি মৃত্যুর মুখ থেকে বাঁচিয়েছি, আর আমার টাকাকড়ি যা ছিল তাও সব দিয়েছি, এখন এর জন্যই ইলিরিয়াতে এসে আমি বিপদে পড়েছি। এখন সে এসব কথা অস্বীকার করছে।"

আদালতের লোকেরা অ্যাণ্টোনিওর কোন কথাই আর শুনতে চাইল না, তাকে তারা গ্রেফতার করে নিয়ে গেল।

ভায়োলা শুনতে পেল, অ্যাণ্টোনিও যাবার সময় বলতে বলতে যাচ্ছে, "সিবাস্টিয়ান, তুমি এত নীচ, এত অকৃতজ্ঞ, তা আমি আগে বুঝতে পারিনি। তুমি আমার সত্যিকারের ভালবাসাকে—আমার বন্ধুত্বকে অস্বীকার করলে,···"

ভায়োলা স্পষ্টই বুঝতে পারল, অ্যাণ্টোনিও তাকে তার ভাই সিবাস্টিয়ান বলে ধরে নিয়েছে। তার মনে হলো, অ্যাণ্টোনিওই তার ভাইকে সমুদ্র থেকে তুলে তার প্রাণ রক্ষা করেছে।

ভাই বেঁচে আছে, এই আনন্দে ভায়োলা অধীর হয়ে উঠল, কিন্তু বদমাশ দুজনের ভয়ে সে তাড়াতাড়ি ডিউকের প্রাসাদের দিকে এগিয়ে গেল।

* * *

অ্যাণ্টোনিওর কথাটা ছিল সত্য। সে একজন জাহাজের ক্যাপ্টেন। জাহাজ-ডুবির ফলে সিবাস্টিয়ান যখন ভেসে যাচ্ছিল, তখন অ্যাণ্টোনিও তাকে উদ্ধার করে। অ্যাণ্টোনিও তাকে এতই ভালোবেসেছে যে সারাক্ষণ তাকে চোখে চোখে রাখে, ছেড়ে বড় একটা থাকে না কোথাও। বোনের খোঁজে সিবাস্টিয়ান ইলিরিয়াতে আসার ইচ্ছা প্রকাশ করলে

অ্যাণ্টোনিও তার সাথী হল, যদিও সে জানত যে ইলিরিয়াতে ধরা পড়লে তার বিপদ হবে। ইলিরিয়াতে এসেই সরাইখানায় খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করতে যাওয়ার সময় নিজের টাকার থলেটা অ্যাণ্টোনিও সিবাস্টিয়ানের হাতে দিয়ে বলে গেল—"তোমার ইচ্ছামত এ থেকে তুমি খরচপত্র করতে পার।" সরাইখানা থেকে ফেরার পথে রাস্তায় হঠাৎ পুরুষবেশী ভায়োলাকে সিবাস্টিয়ান মনে করে তাকে বদমাশদের হাত থেকে বাঁচাতে গিয়েছিল অ্যাণ্টোনিও।

এদিকে বোনের খোঁজে শহরের এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে সিবাস্টিয়ান। ক্রমে এসে হাজির হল অলিভিয়ার বাড়ির সামনে। সার আন্‌দ্রু ও সার টোবি তখনও ভায়োলার খোঁজ করছে। হঠাৎ সিবাস্টিয়ানকে দেখতে পেয়ে তেড়ে এল মারমুখী হয়ে তরোয়াল উঁচিয়ে। সিবাস্টিয়ানও কাপুরুষ ছিল না। সে এই হঠাৎ আক্রমণে বিভ্রান্ত হলেও নিজের তরোয়াল খুলে আত্মরক্ষা করতে গেল। এমন সময় অলিভিয়া বাগান থেকে তাকে দেখতে পেয়ে বাইরে বেরিয়ে এসে সার টোবি ও সার আন্‌দ্রুকে বকাবকি করলেন এবং সিবাস্টিয়ানকে বাড়ির ভিতরে আসবার জন্য সাদরে ডাকলেন।

রাজরানীর মত একজন সুন্দরীর ডাকে সাড়া না দিয়ে পারল না সিবাস্টিয়ান। সে ভিতরে গেল।

অলিভিয়া বুঝতে পারেননি যে সিবাস্টিয়ানকে তিনি আগে কখনো দেখেননি। তাকে সিজারিও বলেই ধারণা করেছেন অলিভিয়া। তাই তিনি আগের মতই ভালোবাসার কথা কইতে লাগলেন তার সঙ্গে। তিনি দেখে অবাক আর খুশী হলেন যে সিজারিও এবার তাঁকে দূরে ঠেলে রাখার বদলে পালটা অনুরাগের লক্ষণ দেখাচ্ছে।

সিবাস্টিয়ান নারীও নয়, এখানে তার কোন মনিবও নেই যাকে ভয় করে চলতে হবে। কাজেই অচেনা সুন্দরী যুবতীর মুখে প্রথম দেখাতেই ভালোবাসার কথা শুনতে পেয়ে সে অবাক্ যেমন হল, আনন্দও তেমন পেল। খুব আগ্রহ করে সেও অলিভিয়াকে প্রেম জানাতে লাগল। অলিভিয়ারও আনন্দের সীমা নেই। তাঁর ধারণা হল, সিজারিওর মন গলেছে। পাছে আবার তার মত পালটে যায়, তাই তিনি তখনই সিবাস্টিয়ানকে বিয়ের বাগ্‌দান সেরে ফেলতে বললেন। সিবাস্টিয়ান রাজী হওয়ায় অলিভিয়া আর দেরি না করে তখনই পুরোহিত ডেকে সিবাস্টিয়ানকে

গির্জায় নিয়ে গেলেন, আর সেখানে দুজনের বিয়ের বাগ্দানের কাজকর্ম সম্পন্ন হল।

অলিভিয়ার সঙ্গে বিয়েটা পাকাপাকি করে সিবাস্টিয়ান বেরিয়ে পড়ল তার বন্ধু অ্যাণ্টোনিওর খোঁজে সরাইখানায়। বিত্তশালিনী সম্ভ্রান্ত ঘরের একজন অতি সুন্দরী মহিলা তাকে যেচে ডেকে নিয়ে তার প্রেমে হাবুডুবু খেয়ে তাকে বিয়ে করবেন বলে বাগ্দান করিয়েছেন—এ সৌভাগ্যের কথাটা প্রিয় বন্ধু অ্যাণ্টোনিওকে না বললেই নয়।

সরাইখানায় অ্যাণ্টোনিওকে দেখতে না পেয়ে সিবাস্টিয়ান শহরের এদিক্ ওদিক্ খানিকটা ঘুরে নিল। তারপর অলিভিয়ার বাড়ির কাছাকাছি আসতেই সার টোবি ও সার আন্‌ড্রুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। অলিভিয়া এর জন্য তাদের হাতছাড়া হয়ে গেছে, তাই দুজনে এখন সিবাস্টিয়ানকে শাস্তি দেবার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। তারা দুজনেই তরোয়াল হাতে সিবাস্টিয়ানের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, কিন্তু সিবাস্টিয়ান তরোয়াল চালানোয় ক্ষিপ্র ও দক্ষ বলে শীঘ্রই তাদের দুজনকে জখম করে সরে পড়ল অলিভিয়ার বাড়ির দিকে।

এই সময় অলিভিয়ার বাড়ির সামনে এসে পড়লেন ডিউক অর্সিনো। তাঁর সঙ্গে রয়েছে ভায়োলা। সেখানেই আদালতের লোকেরা অ্যাণ্টোনিওকে হাজির করল তাঁর কাছে। ডিউক তার বিচার করবেন।

অ্যাণ্টোনিওকে দেখিয়ে ভায়োলা ডিউককে বলল, "ওই লোকটি আমাকে আজ বদমাশদের হাত থেকে বাঁচিয়েছে।"

ডিউক অ্যাণ্টোনিওকে দেখে বললেন, "আরে, ওই জলদস্যুটাকে তো আমি চিনি।" এই বলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "ওরে নিমকহারাম জোচ্চোর! কোন সাহসে তুই আবার ইলিরিয়ায় ফিরে এলি?"

অ্যাণ্টোনিও বলল, "আমি স্বীকার করছি যে আমি আপনার শত্রু, কিন্তু আমি নিমকহারামও নই, জোচ্চোরও নই! সে হচ্ছে আপনার পাশে দাঁড়িয়ে আছে ওই অকৃতজ্ঞ নরাধমটা।"—এই বলে সে ভায়োলাকে দেখিয়ে দিল।

ডিউক বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি ব্যাপার খুলে বল্!"

অ্যাণ্টোনিও তখন বলল, "সমুদ্রে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে ওকে বাঁচিয়েছি আমি, তিনমাস ওকে খাইয়ে পরিয়ে নিজের কাছে কাছে রেখেছি, এই শহরে আসায় আমার যে বিপদ হতে পারে তা জেনেও

ওকে খুশী করবার জন্য এখানে এসেছি, আর মাত্র আধঘন্টা আগে আমার দেওয়া টাকাকড়ি আত্মসাৎ করে এখন ওই নরাধম বলছে যে সে জীবনে আমাকে কখনো দেখেনি !"

ভায়োলা তীব্র প্রতিবাদ করে বলল, "না—না ! ওসব কথা একেবারে মিছে !"

ডিউক ভায়োলাকে দেখিয়ে অ্যান্টোনিওকে জিজ্ঞাসা করলেন, "এই লোকটা এই শহরে কবে এসেছে বল্তো ?"

সঙ্গে সঙ্গে জবাব এল অ্যান্টোনিওর, "আজই সকালে।"

ডিউক অ্যান্টোনিওকে বললেন, "পাগলের মত যা তা বকছিস্ কেন ? এই লোকটা তো তিনমাস ধরে আমার কাছেই চাকরি করছে।"

ডিউক আর একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলেন এমন সময় অলিভিয়া সেখানে এসে হাজির হলেন। নিজের স্বামীর বিরুদ্ধে নালিশ হচ্ছে শুনে ডিউকের সামনে না এসে তিনি থাকতে পারেননি।

এসেই অলিভিয়া ভায়োলাকে নিজের স্বামী বলে সম্বোধন করে কথা বলতে যাচ্ছেন দেখে ডিউক নিজেই থ মেরে গেলেন।

ডিউকের রাগ সহসা চড়ে উঠল নিজের ভৃত্য ভায়োলার উপর। তিনি বুঝতে পারলেন যে তাঁর ভৃত্য ভায়োলা তাঁকে ঠকিয়েছে, আর অলিভিয়ার কাছে তাঁর দূতের কাজের সুযোগে অলিভিয়ার সঙ্গে প্রেম করে বিয়ে করেছে। তিনি ভায়োলাকে প্রবঞ্চনার জন্য কঠিন শাস্তি দেবেন বললেন। এতে ভায়োলা একটুও ভয় না পেয়ে বলল, "আপনার হাতে মরতেও আমার আপত্তি নেই, আপনাকে যে আমি প্রাণের চেয়েও ভালবাসি।"

ডিউক এ কথায় চমকে উঠলেন, অলিভিয়া তো চিৎকার করে বলে উঠল, "এ সব কি যা তা বলছ, সিজারিও ! তুমি কি কিছুক্ষণ আগে পুরোহিতের সামনে আমাকে বিয়ে করবে বলে বাগ্‌দানে আবদ্ধ হওনি ?"

ভায়োলা দৃঢ়স্বরে বলল, "না, কখনই নয়।"

এই সময় পুরোহিত এসে ডিউককে জানালেন যে অলিভিয়ার কথাই সত্যি, সিজারিওর সঙ্গে অলিভিয়ার বাগ্‌দান হয়ে গেছে।

ডিউক এবার নিঃসন্দেহ হলেন যে ভায়োলা জঘন্য মিথ্যা কথা বলছে, আর এই বজ্জাত জলদস্যুটাও মিথ্যা কথা বলে তাঁকে বিভ্রান্ত করছে।

এই সময় চিৎকার করতে করতে সার আন্‌ক্রু ও সার টোবি সেখানে এসে হাজির। দুজনেই দারুণ জখম হয়েছে, তাদের গা থেকে রক্ত ঝরছে।

ডিউকের পেছনে সিজারিওকে দেখতে পেয়ে তারা চেঁচিয়ে উঠল, "এই যে সেই ছোকরা! আমাদের জখম করে এসে দিব্যি ভালমানুষের মত ডিউকের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে!"

ডিউক বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "কখন সিজারিও তোমাদের জখম করতে গেল? ও তো অনেকক্ষণ আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে।"

ভায়োলা সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে বলল, "মিছে কথা! ওসব মিছে কথা! আমি ওদের জখম করিনি।"

এরকম গোলমেলে অবস্থায় ডিউক কি করবেন ঠিক করতে পারছেন না, এমন সময় সিবাস্টিয়ান সেখানে এসে হাজির। এসেই সে অলিভিয়ার কাছে ক্ষমা চাইল তাঁর দুই আত্মীয়কে জখম করার জন্য।

অলিভিয়া দেখেন—তাঁর সামনে দুই স্বামী হাজির। একই আকার, একই বয়স, একই মুখশ্রী, একই ধরনের পোশাক! ডিউক দেখেন দুই সিজারিও।

অ্যাণ্টোনিও দেখে তার দুই বন্ধু। সিবাস্টিয়ান দেখে তার যেন এক যমজ ভাই এসে জুটেছে কোথা থেকে।

সিবাস্টিয়ানকে দেখেই ভায়োলা ছুটে তার কাছে গেল, আর তার হাত ধরে আনন্দের উচ্ছ্বাসে বলল, "তুমিও আমায় চিনতে পারছো না—আমি যে তোমার হারানো বোন ভায়োলা।"—এই বলে সে সকলের সামনে বলল যে সে পুরুষবেশী একজন নারী।

তাঁর ভৃত্য সিজারিও যে নারী, একথা শুনে ডিউক বিস্মিত হলেন। পুরুষ বলে ওকে যতক্ষণ জেনেছিলেন, ততক্ষণ ওর উপর তাঁর স্নেহ ছিল অনেকখানি। এখন ওকে নারী বলে জানতে পারার সঙ্গে সঙ্গেই সেই স্নেহ প্রেমরূপে প্রকাশ পেল। এদিকে অলিভিয়া যখন সিবাস্টিয়ানকে পতিরূপে গ্রহণ করেছেন, তখন ভায়োলাকে পত্নীরূপে গ্রহণে ডিউকের বাধা কোথায়। ভায়োলা তো আগে থেকেই বলেছে যে সে ডিউককে নিজের প্রাণের চেয়ে ভালবাসে।

এরপর দুটি বিয়ে একদিনেই খুব জাঁকজমকের সঙ্গে হয়ে গেল।

এই উপলক্ষে ডিউক অ্যাণ্টোনিওকে আগের অভিযোগ থেকে রেহাই দিলেন।

———



বড় এণ্টিফোলাস মোটে তাঁকে বোঝাতেই পারলেন না যে তিনি তাঁর স্বামী নন—সম্পূর্ণ এক অপরিচিত ব্যক্তি।



কমেডি অব এরর্স

সেকালের সিরাকিউজ খুব নাম-করা বন্দর। এখানকার সওদাগরেরা হচ্ছেন কুবেরের মত ধনী। তাঁদের জাহাজ সাত সাগরে ঘুরে বেড়ায় মাল বোঝাই করে। বিভিন্ন বন্দরে তাঁদের ছোট-বড় আড়ত খোলা আছে। আর আছে সেখানে তাঁদের বিশ্বস্ত এক-একজন গোমস্তা। এদের মারফত এসব বন্দরে মাল কেনাবেচা হয়। এভাবে সওদাগরি শেষ হলে একদিন তাঁদের জাহাজ দেশবিদেশ থেকে হীরা, মণি, মানিক ও দামী দামী সব শৌখিন জিনিসের পসরা নিয়ে আবার সিরাকিউজে ফিরে আসে।

তখনকার দিনের জাহাজে ভাল কল-কবজা তেমন ছিল না। ঝড়-তুফানের মুখে পড়লে জাহাজটা বাঁচাবার আশাও থাকত না বড় একটা। তবুও সওদাগরেরা ঘরে চুপচাপ বসে থাকার কথা চিন্তাও করতে পারতেন না। জীবনটা অনিশ্চিতের হাতে সঁপে দিয়ে তাঁরা বিভিন্ন সাগরে দিনরাত ঘুরে বেড়াতেন।

ইজিয়ন ছিলেন এমনি একজন সওদাগর। ধন-সম্পদের সীমা নেই তাঁর। ঘরে বসে থাকলেও তিনি রাজার হালে দিন কাটাতে পারেন, তবু সওদাগরি থেকে অবসর নেবার কথা ভাবতেও পারতেন না। বরং যতই দিন যেতে লাগল, ব্যবসার উপর তাঁর নেশা ততই যেন বাড়তে থাকল। শেষে একদিন তাঁর এপিড্যামনামের গোমস্তা যখন মারা গেল,

তখন অন্য কর্মচারী না পাঠিয়ে ব্যবসায় কাজকর্ম দেখবার জন্য তিনি নিজেই চলে গেলেন সেখানে।

কিন্তু সেখানে গিয়ে নানা কাজে জড়িয়ে পড়লেন ইজিয়ন, তাই শীঘ্রই গৃহে ফিরে আসতে পারলেন না। এদিকে সিরাকিউজে তাঁর পত্নী আমেলিয়া মহা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, এবং স্বামীর খোঁজে অন্য এক বণিকের জাহাজে চড়ে এপিড্যামনামে চলে গেলেন।

এপিড্যামনামে আসার কয়েকদিনের মধ্যে আমেলিয়া যমজ সন্তান প্রসব করলেন। দুজনেই ছেলে, আর তাদের দুজনের চেহারা হুবহু একরকম। অন্য লোকের কথা দূরে থাক, নিজের বাপ মাও তাদের চেহারার ভিতর কোন তফাত সহসা খুঁজে বার করতে পারতেন না।

প্রকৃতির খেয়ালও অদ্ভুত। প্রায় ঐ একই সময়ে ইজিয়নের বাড়ির নিকটে এক গরিব স্ত্রীলোকও যমজ সন্তান প্রসব করে মারা গেল। এরাও দুজনে ছেলে আর এদের চেহারার মিল হয়েছে ষোল-আনা ইজিয়নের ছেলেদের মতই। ইজিয়ন দয়াপরবশ হয়ে এই অনাথ যমজ ছেলে দুটিকে নিজের বাড়িতে এনে পালন করতে আরম্ভ করলেন। বড় হয়ে এরা কী করবে, তাও এদের শৈশব থেকেই ঠিক হয়ে রইল। ইজিয়নের দুই ছেলের ভৃত্য হবে এই দুটি অনাথ ছেলে।

এভাবে দুইজোড়া সমবয়সী যমজ ছেলে একই বাড়িতে একই সঙ্গে মানুষ হতে লাগল। চেহারার দিক্ দিয়ে এক একটা জোড় যখন একেবারে একরকম, তখন তাদের নাম আলাদা রাখবার কোন দরকার আছে বলে মনে করলেন না ইজিয়ন। নিজের দুই ছেলের একই নাম রাখলেন— দুজনের নামই হল অ্যান্টিফোলাস। নাম এক হলেও জোড়েদের এক একটাকে বড় আর ছোট বলে ডাকা হতে লাগল, তা নইলে কাজকর্মে অসুবিধা। তাই একজনকে বলা হত বড়-অ্যান্টিফোলাস এবং আর একজনকে বলা হত ছোট-অ্যান্টিফোলাস।

আর অনাথ শিশু দুটিরও একই নাম ড্রোমিও রাখা হল। একজনকে বলা হত বড়-ড্রোমিও এবং আর একজনকে বলা হত ছোট-ড্রোমিও।

যমজ ছেলেরা কিছুটা বড় হতেই সিরাকিউজে ফেরবার জন্য তৈরী হলেন ইজিয়ন। জাহাজ তাঁর নিজেরই। স্ত্রী আমেলিয়া এবং যমজ অ্যান্টিফোলাস ও যমজ ড্রোমিওকে নিয়ে তিনি সিরাকিউজের অভিমুখে জাহাজে রওনা হলেন।

কিছুদূর বেশ আরামেই গেলেন তাঁরা। সাগরের মৃদু বাতাসে পাল তুলে দিয়ে হেলে দুলে চলেছে জাহাজ। নীলজলে সূর্যের কিরণ ঝলমল করছে। অপরূপ রঙের খেলা দেখতে দেখতে আনন্দে বিভোর হয়ে পড়েছেন ইজিয়ন আর তাঁর স্ত্রী আমেলিয়া।

হঠাৎ আকাশে উঠল মেঘ। দেখতে দেখতে ঝড় এল সোঁ সোঁ রবে। সাগরে উঠল পাহাড়ের মত ঢেউ। আকাশ ভেঙে নামল মুষলধারায় বরষা। পাল ছিঁড়ে, মাস্তুল ভেঙে জাহাজ ডুবে যায় আর কি!

জাহাজে একখানা করে নৌকা থাকে। বিপদ দেখে নাবিকেরা সেটা আগে থেকেই অধিকার করে বসল। নিজেদের প্রাণের ভয়ে এমন দিশাহারা হয়ে উঠল তারা যে তাদের মনিব ও তাঁর স্ত্রী এবং দুইজোড়া যমজ ছেলেদের দিকে তাকাবার কথা আর তাদের মনেই পড়ল না। তারা কী করে বাঁচবে সে-ভাবনা একটিবারও না করে নিজেদের প্রাণ বাঁচাবার জন্যই তারা ব্যাকুল হল। এখনি জাহাজ ডুববে দেখে তারা তাড়াতাড়ি নৌকো ভাসালে অকূল দরিয়ায়। দেখতে দেখতে ঢেউয়ের ধাক্কা লেগে নজরের বাইরে চলে গেল নৌকোখানা!

ইজিয়ন প্রথমটা হতবাক্ হয়ে গিয়েছিলেন নাবিকদের এই নিমকহারামি দেখে। এখন তিনি চেতনা ফিরে পেলেন যেন! কী করে ছেলেদের বাঁচানো যায় এবং আমেলিয়ার ও নিজের প্রাণ রক্ষা করা যায়, তারই উপায় চিন্তা করতে লাগলেন। একটা বাড়তি মাস্তুল ছিল জাহাজে, তাই নিয়েই সাগরে ভেসে পড়লেন তাঁরা। মাস্তুলের দুইদিকে সমান ভার রাখবার জন্য তাঁর স্ত্রী একদিকে, আর তিনি নিজে আর একদিকে রইলেন। ছোট-অ্যান্টিফোলাস আর ছোট-ড্রোমিওকে মাস্তুলে বেঁধে দেওয়া হল স্ত্রীর দিকটাতে, বড়-অ্যান্টিফোলাস ও বড়-ড্রোমিওকে বেঁধে দেওয়া হল ইজিয়নের নিজের হাতের কাছে। মাস্তুল সাগরে ভাসতে ভাসতে হাবুডুবু খেতে খেতে চলল।

কিছুপরে দুদিক থেকে দুখানা জাহাজ তাঁদের দেখতে পেয়ে, এগিয়ে এল দ্রুতবেগে। ঝড় তখন কমেছে; প্রাণের আশা ফিরে এল ইজিয়নের আর তাঁর স্ত্রীর। কিন্তু শেষ মুহূর্তে ঘটে গেল এক নিদারুণ বিপদ্।

জলের তলায় ছিল এক পাহাড়। সেই চোরা-পাহাড়ের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে তাঁদের কাঠের মাস্তুলটা মাঝখানে ভেঙে দুটুকরো হয়ে গেল। এক টুকরো ধরে ভাসতে লাগলেন ইজিয়ন ও একজোড়া শিশু এবং অন্য

টুকরো ধরে ভাসতে লাগলেন তাঁর স্ত্রী আমেলিয়া ও আর একজোড়া শিশু।

ঢেউয়ে ঢেউয়ে বিপরীত দিকে ভেসে চলল মাস্তুলের দুটি টুকরো। কী করবেন ইজিয়ন? কোন উপায়ই যে তাঁর নেই! স্ত্রীর দিকে এগিয়ে যাওয়ার কোন চেষ্টাই তিনি করতে পারলেন না। তাঁরা পরস্পরের নজরের বাইরে চলে গেলেন বিপরীত দিকে ভাসতে ভাসতে।

এবার দুদিক থেকে দুখানা জাহাজ এসে পড়ল। একখানা জাহাজ তুলে নিল ইজিয়ন ও তাঁর সঙ্গের শিশু দুটিকে। আর একখানাতে আশ্রয় পেলেন ইজিয়নের স্ত্রী আমেলিয়া ও অপর দুটি শিশু। তারপর দুটো জাহাজই তাদের নিজের নিজের পথে চলে গেল।

ইজিয়ন যে জাহাজে উঠলেন, তা থেকে বার বার সংকেত করা হল অপর জাহাজকে নিকটে আসার জন্য। কিন্তু সে-সংকেত সে-জাহাজের লোকেরা দেখেও দেখল না। মতলব তাদের ভাল ছিল না। স্ত্রীলোকটিকে কোন বিজন উপকূলে নামিয়ে দিয়ে শিশু দুটিকে চুরি করাই তাদের মতলব। তারা ছিল করিন্থের জেলে-নাবিক।

* * *

সেই সাংঘাতিক দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরে ইজিয়ন বড়-অ্যান্টিফোলাস ও বড়-ড্রোমিওকে নিয়ে সিরাকিউজে নিজের বাড়িতে ফিরেছিলেন। তারপর লোকের পর লোক পাঠিয়ে দেশবিদেশ তোলপাড় করতে শুরু করেছিলেন হারানো স্ত্রী ও তাঁর সঙ্গের শিশু দু'টিকে খুঁজে বার করবার জন্য। কিন্তু ইজিয়নের ভাগ্য বিরূপ, তাঁর কোন চেষ্টাই এ পর্যন্ত সফল হয়নি।

বহুদিন কেটে গেল। বড়-অ্যান্টিফোলাস এখন যুবক। মায়ের ও ভাইয়ের কথা সে শুনেছে। পিতার মত সেও বিশ্বাস করে যে তাঁরা এখনো জীবিত, আর সিরাকিউজে ফিরে আসার কোন উপায় করতে না পেরে বিদেশে পড়ে আছেন নিদারুণ দুঃখ-কষ্টের মধ্যে। মা ও ভাইকে জ্ঞান হয়ে অবধি সে কখনো দেখেনি, অথচ তাদের সঙ্গে নাড়ির টান সে অহরহ অনুভব করে। প্রাণ হুহু করে কাঁদে তার মা ও ভাইয়ের জন্য।

শেষে একদিন বড়-অ্যান্টিফোলাস ইজিয়নকে বলল, "বাবা, আমি এবার মা ও ভাইকে খুঁজে বার করতে বিদেশে যাব।"

ইজিয়ন ছেলের এই প্রস্তাবে আপত্তি করলেন না। সেই ভয়াবহ বিপদ ঘটে যাওয়ার পর থেকেই তিনি রোজ ভাবেন—সওদাগরি ছেড়ে

তাঁর নিজেরই দেশে দেশে ঘুরে বেড়ানো উচিত বউ-ছেলেকে খোঁজবার জন্য। কিন্তু শিশু বড়-অ্যান্টিফোলাসকে বাড়িতে একা ফেলে রেখে তিনি তা পারেননি। এখন অবশ্য সে ছেলে বড় হয়েছে। এখন ইজিয়ন তাকে বাড়িতে রেখে অনায়াসেই বিদেশে বেরিয়ে পড়তে পারেন হারানো বউ-ছেলের খোঁজে। কিন্তু ইজিয়ন এখন বুড়ো হয়ে গেছেন—দীর্ঘদিন ধরে একনাগাড়ে দেশে দেশে ঘুরে বেড়ানো এখন তাঁর শরীরে সইবে না।

বাবার মত নিয়ে বিদেশে বেরিয়ে পড়ল বড়-অ্যান্টিফোলাস, তার সঙ্গে গেল বড়-ড্রোমিও। কোন দেশেই তারা ঘুরতে বাকি রাখল না। কিন্তু নাঃ, মা-ভাইয়ের কোন খোঁজই বড়-অ্যান্টিফোলাস পেল না।

কিন্তু সে কিছুতেই দমে না। ভাবে—"অমুক শহর তো দেখা হয়নি! এবার সেখানেই যাই! হয়ত সেখানেই ওদের দেখা পাব।" আবার তল্পি-তল্পা গুটিয়ে জাহাজে চড়ে বসে সেই শহরে যাবার জন্য।

এভাবে বহু দিন কেটে গেল। সিরাকিউজে বুড়ো ইজিয়ন চিন্তাভাবনায় অধীর হয়ে উঠলেন। যারা আগে হারিয়েছিল, তাদের শোক ধীরে ধীরে সয়ে এসেছিল একরকম। কিন্তু তাদের খুঁজতে গিয়ে যে ছেলে তাঁর কাছে ছিল সে এখন হারিয়ে গেলে সে-দুঃখ আর সইতে পারবেন না ইজিয়ন। কয়েক বছর পথ চেয়ে থাকার পরও বড়-অ্যান্টিফোলাস যখন সিরাকিউজে ফিরল না, তখন ব্যাকুল হয়ে ইজিয়ন নিজেই আবার ঘর ছেড়ে বেরুলেন। স্ত্রী আমেলিয়া ও তাঁর সঙ্গের ছেলে দুটিকে ফিরে পাওয়ার আশা আর তাঁর নেই, এখন বড়-অ্যান্টিফোলাস ও বড়-ড্রোমিওকে ফিরে পেলেই তিনি নিজেকে ভাগ্যবান বলে মানবেন।

কয়েকটা শহরে খোঁজাখুঁজি করে ইজিয়ন জাহাজ থেকে নামলেন এফিসাস বন্দরে। এও অতি জমকালো বন্দর। বিস্তর জাহাজের যাতায়াত এখানে। নানা দেশের নানা লোক এখানে জড়ো হয়েছে এসে।

জাহাজঘাটায় নামতেই রাজকর্মচারীরা এসে নানা প্রশ্ন শুরু করল, যেমন সকল বন্দরেই করে থাকে। মামুলী সব প্রশ্ন করে, আর তাদের উত্তরও হয় মামুলী। কিন্তু হঠাৎ যেন ফাঁকা আকাশ থেকে বাজ পড়ল ইজিয়নের মাথায়। সিরাকিউজ নগরে তাঁর বাড়ি—এই কথা শোনামাত্রই রাজকর্মচারীরা তাঁকে গ্রেফতার করল। তাঁর সমস্ত জিনিসপত্র ও নগদ অর্থ রাজসরকারে বাজেয়াপ্ত করে তাঁকে নিয়ে চলল ডিউক অর্থাৎ দেশের রাজার কাছে।

ইজিয়ন ব্যাকুল হয়ে এরকম ব্যবহারের কারণ জানতে চাইলে তাঁকে শুধু এই কথা জানানো হল যে অল্প কয়েকদিন আগে বাণিজ্যের ব্যাপারে একটা গোলযোগের দরুন দারুণ কলহ বেধেছে এফিসাস ও সিরাকিউজের ডিউকদের মধ্যে। সেই কারণে এফিসাসের ডিউক হুকুম জারি করেছেন—সিরাকিউজের কোন বাসিন্দা এ-শহরে এলে তার সবকিছু বাজেয়াপ্ত করে তার মাথা কেটে ফেলা হবে। অবশ্য এফিসাসের কোন নাগরিক যদি বন্দীর হয়ে হাজার মোহর জরিমানা দিতে রাজী হয়, তাহলে বন্দী প্রাণটা ভিক্ষা পেতে পারে।

ইজিয়ন চোখে আঁধার দেখলেন। হাজার মোহর কেন, তার চেয়ে অনেক বেশী অর্থ ইজিয়নের কাছেই ছিল। কিন্তু তা তো আগেই রাজ-সরকারে বাজেয়াপ্ত হয়েছে। এখন তো ইজিয়ন একজন পথের ভিক্ষুক, একটা কানাকড়িও তাঁর নেই। তাঁর হয়ে কে এখানে হাজার মোহর জরিমানা দিতে আসবে? এখানে তাঁর কোন বন্ধু বা আত্মীয় তো নেই!

ডিউকের কাছে যখন ইজিয়নকে হাজির করা হল, তিনিও সরাসরি হুকুম দিলেন যে ইজিয়নের হয়ে হাজার মোহর জরিমানা যদি কেউ দেয়, তবেই ইজিয়ন মুক্তি পাবেন, নইলে আজই সন্ধ্যায় ইজিয়নের মাথা কাটা যাবে।

ইজিয়নের বিপদের কথা সারা নগরের লোককে জানিয়ে দেবার জন্যও ডিউক হুকুম দিলেন। যদি কোন সদয় লোক অর্থ দিয়ে ইজিয়নকে বাঁচাতে এগিয়ে আসে তো তাঁর কোন আপত্তি নেই।

ঠিক হল, সন্ধ্যা পর্যন্ত ইজিয়ন থাকবেন কারাগারে। প্রহরীরা তাঁকে আঁধার কয়েদখানায় নিয়ে গেলে অভাগা ইজিয়ন শেষবারের মত স্ত্রী আর ছেলেদের স্মরণ করে চোখের জল ফেলতে লাগলেন।

* * *

ঠিক সেই সময়ে আর একখানি জাহাজ এসে ভিড়ল এফিসাসের জাহাজ-ঘাটায়। নানা দেশ ঘুরে ফিরে বড়-অ্যান্টিফোলাস সেই জাহাজে চড়ে এফিসাসে এসে পৌঁছলেন, সঙ্গে তাঁর ভৃত্য বড়-দ্রোমিও।

তাঁর ভাগ্য ভাল, ওই জাহাজেই এফিসাসের বাসিন্দা একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়েছিল। সিরাকিউজের নাগরিকেরা এফিসাসে এলে যে কি বিপদে পড়বে, তা এই ভদ্রলোক জানিয়ে দিলেন বড়-অ্যান্টিফোলাসকে ও তাঁর ভৃত্যকে, আর বার বার সতর্ক করে দিয়ে

বললেন, "নিবাস কোথায় জিজ্ঞাসা করলেই অন্য কোন দেশের নাম বলবেন। কোনমতেই যেন সিরাকিউজের নাম মুখ থেকে না বেরোয়, তা বেরুলেই মাথাটি কাটা যাবে।"

বিপদ এড়িয়ে জাহাজঘাটার বাইরে এসে বড়-অ্যান্টিফোলাস তাঁর ভৃত্য বড়-ড্রোমিওকে সঙ্গের মালপত্র দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন শহরের সবচেয়ে সেরা হোটেলে—যার নাম সেণ্টর। নিজের টাকাকড়িও যা ছিল, তাও তিনি বড়-ড্রোমিওর হাতে দিলেন হোটেলে জমা রাখবার জন্য। কারণ অজানা অচেনা শহরে বেশী টাকাকড়ি সঙ্গে নিয়ে রাস্তায় বেরুনো নিরাপদ নয়।

বড়-ড্রোমিও সেণ্টরে চলে গেল। বড়-অ্যান্টিফোলাসও শহরের অন্য পথে চললেন একটা ক্ষীণ আশা নিয়ে—যদি মা ও ভাইয়ের কোন হদিস এখানে পাওয়া যায়! দুচারটে রাস্তা সবে তিনি পেরিয়ে গেছেন, ড্রোমিও এসে বলল, "কর্তা, বাড়ি চলুন। খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে; গিন্নীমা আমায় পাঠিয়ে দিলেন।"

বড়-অ্যান্টিফোলাস তো একথা শুনে অবাক্! যে লোকটি একথা বলল, সে যে ড্রোমিও তাতে তাঁর কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এ বলে কী! এ শহরে তাঁর বাড়ি এল কোথায়? গিন্নীমাই বা কে? চাকরটা কি পাগল হয়ে গেল নাকি, না সে মনিবের সঙ্গে রসিকতা করছে?

বিরক্তভাবে তিনি ধমক দিয়ে উঠলেন, "তোর ইয়ারকি রাখ, বাঁদর! টাকাগুলো হোটেলে ঠিকমত জমা দিয়েছিস্ তো?"

"টাকা! হোটেল!"—ড্রোমিও যেন আকাশ থেকে পড়লো, সে বলল, "কর্তা! ইয়ারকি আমি করলাম, না আপনি করলেন? আপনার বাড়ি থেকে আপনার গিন্নী আপনাকে খাবার খেতে ডাকছেন। আর এখানে আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন হোটেলে টাকা জমা দেওয়া হয়েছে কিনা! চলুন চলুন, দেরি হলে খাবার হবে ঠাণ্ডা, আর গিন্নীমা হবেন গরম!"

বার বার ওই একই বাজে কথা, আর একই ধরনের ন্যাকামি। বড়-অ্যান্টিফোলাস আর নিজের মাথা ঠিক রাখতে পারলেন না। রাস্তার মাঝখানেই ড্রোমিওকে বেশ-খানিকটা উত্তম-মধ্যম দিয়ে তিনি হনহন করে ছুটে চললেন সেণ্টর হোটেলের দিকে।

যে ড্রোমিও মার খেল, সে কিন্তু আসলে বড়-অ্যান্টিফোলাসের ভৃত্য বড়-ড্রোমিও নয়। সে হল এফিসাসের স্থায়ী-বাসিন্দা ছোট-অ্যান্টিফোলাসের ভৃত্য ছোট-ড্রোমিও। দুজনে দেখতে একরকম বলে বড়-অ্যান্টিফোলাস

বুঝতেই পারেন নি যে যাকে তিনি মারলেন, সে তাঁর ভৃত্য নয়, সে হচ্ছে তাঁর হারানো ভাইয়ের ভৃত্য—যাদের খোঁজে তিনি কতদিন ধরে দেশ-বিদেশ তোলপাড় করে বেড়াচ্ছেন।

* * *

ছোট-অ্যান্টিফোলাস এবং তার মা আমেলিয়া ও ছোট-ড্রোমিওকে সাগর থেকে জাহাজে তুলে নিয়ে করিন্থের জেলে-নাবিকরা পালিয়ে গেল। কিছুদূর যাবার পর তারা মায়ের কাছ থেকে ছেলে দুটিকে কেড়ে নিয়ে মাকে একাকী ডাঙায় নামিয়ে দিয়ে চলে গেল বহুদূরে। ছেলেহারা আমেলিয়া কান্নায় ভেঙে পড়ে পাগলিনীর মত হয়ে গেল। আর এদিকে সেই বদমাশ জেলে-নাবিকরা ছেলে দুটিকে দাস হিসেবে বিদেশের বাজারে বেচে দিল। নানা দুঃখকষ্ট সহ্য করবার পর ছেলে দুটি আশ্রয় পেল একজন অতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের কাছে। তিনি ছিলেন এফিসাসের ডিউকের একজন উঁচুদরের সেনাপতি। ছোট-অ্যান্টিফোলাস যৌবনেই যুদ্ধবিদ্যায় বাহাদুরি দেখিয়ে ডিউকের সুনজরে পড়ে গেলেন। ডিউক তাঁকে নিজের শহরেই বাড়ি করে দিলেন, আর নিজের নিকট-আত্মীয় এক ধনী সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে তাঁর বিয়ে দিলেন, ছোট অ্যান্টি-ফোলাসের বউ-এর নাম আদ্রিয়ানা।

* * *

ছোট-ড্রোমিও বড়-অ্যান্টিফোলাসের হাতে মার খেয়ে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরে গিয়ে আদ্রিয়ানার কাছে নালিশ করল। সে তাঁকে জানাল, "কর্তা বদ্ধ পাগল হয়েছেন, গিন্নীমা! নিজের বাড়ির কথা বা আপনার কথা তাঁকে যেই বললাম, তিনি যেন কিছু বুঝতেই পারলেন না, আর কেবল আমাকে হোটেলে টাকা জমা দিয়েছি কিনা জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন!" এই বলে সে মারের দাগগুলো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আদ্রিয়ানাকে দেখাতে লাগল।

এই অদ্ভুত কথা শুনে আদ্রিয়ানা তো হতভম্ব! স্বামী পাগল হয়ে যাবেন—এ কী কথা! তিনি আবার ছোট-ড্রোমিওকে তার আপত্তি সত্ত্বেও পাঠালেন তাঁর স্বামীর কাছে। কিন্তু ছোট-ড্রোমিও যদি আবার মার খেয়ে ফিরে আসে, বা মোটেই তাঁর স্বামীর দেখা না পায়—এই ভেবে তিনি আর ধৈর্য ধরে বসে থাকতে না পেরে নিজেই খানিক পরে বেরিয়ে পড়লেন, সঙ্গে নিলেন অবিবাহিতা ছোট বোন লুসিয়ানাকে।

এদিকে বড়-অ্যান্টিফোলাস সেন্টর হোটেলে ফিরে গিয়ে জানতে পারলেন যে তাঁর ভৃত্য বড়-ড্রোমিও টাকাকড়ি সব হোটেলে জমা দিয়েছে, আর সেখানে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা ঠিক করে আবার বাইরে বেরিয়েছে। টাকা নিরাপদে আছে শুনে তিনিও নিশ্চিন্ত হয়ে শহর দেখতে বেরোলেন। পথে তাঁর সঙ্গে দেখা হতেই বড়-ড্রোমিও এগিয়ে এসে যা যা কাজ করে এসেছে, সে সবই বড়-অ্যান্টিফোলাসকে বলল।

বড়-অ্যান্টিফোলাস তো অবাক্! এই চাকরটা এইমাত্র কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল, আবার এখুনি এসে হাসতে হাসতে বলছে হোটেলের ব্যবস্থা ঠিক করে এলাম? সত্যি সত্যি ও পাগল হয়েছে কিনা, তাই পরখ করবার জন্যই তিনি তাকে খুব ধমকিয়ে বললেন, "তাহলে একটু আগে তুই এসে বাড়ি যাওয়ার কথা, গিন্নীমার কথা—কী সব আবোল-তাবোল বলছিলি কেন আমাকে?"

একথা শুনে বড়-ড্রোমিও হতভম্ব হয়ে গেল। সে জোর দিয়ে বলতে লাগল যে সে ওসব কিছুই জানে না, কিছুই বুঝতে পারছে না।

দুজনে এই নিয়ে কথা-কাটাকাটি হচ্ছে, এমন সময় আদ্রিয়ানা সেখানে এসে হাজির হল ছোট বোন লুসিয়ানাকে নিয়ে। এসেই বড়-অ্যান্টিফোলাসকে স্বামী বলে ডেকে আদ্রিয়ানা ঝড়ের মত নালিশের পর নালিশ শুনিয়ে বলতে লাগল, "চাকরটাকে খামকা মেরেছ কেন? তোমার নাকি বাড়িঘর নেই? স্ত্রীও নাকি তোমার নেই কেউ? হোটেলে থাকবার জন্যে নাকি টাকা জমা দিয়েছ? এসব কী কথা? আমার অপরাধটা কী হল যে তুমি আমাকে ত্যাগ করতে চাইছ?"

বড়-অ্যান্টিফোলাস ভেবাচাকা খেয়ে গেলেন। এই অস্বস্তিকর বিশ্রী পরিস্থিতিতে বিভ্রান্ত হয়ে পড়লেও তিনি ঠাণ্ডা মাথায় আদ্রিয়ানাকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন যে তিনি তাঁর স্বামীই নন, তিনি একজন বিদেশী অচেনা লোক।

আদ্রিয়ানা এবার মেজাজ দেখিয়ে বড়-অ্যান্টিফোলাস-এর সঙ্গে কথা-বার্তা শুরু করলেন। তাঁর স্বামী যে পাগল হয়ে গেছেন এ বিষয়ে আর তাঁর সন্দেহ নেই।

এদিকে রাজপথে একটা বিশ্রী গোলমাল দেখে লোক জমে যেতে লাগল একে একে। বাধ্য হয়ে বড়-অ্যান্টিফোলাস ভাবলেন—আপাততঃ

এই ভাল মানুষের মেয়ের সঙ্গে তাঁর বাড়িতে না হয় যাওয়াই যাক, তারপর সেখানে খেতে খেতে তাঁর ভুলটি ভাঙিয়ে দেওয়া যাবে।

এই ভেবে তিনি বড়-ড্রোমিওকে নিয়ে আড্রিয়ানার সঙ্গে তার বাড়িতে এলেন। আড্রিয়ানা বাড়িতে ঢুকেই বড়-ড্রোমিওকে দরজায় কড়া পাহারা দিতে হুকুম দিলেন, আর বললেন,—কোনমতেই যেন কারও কথাতে বাড়ির দরজা খুলে না দেওয়া হয়, কারণ তার মনিবের মাথা খারাপ হয়েছে। তিনি আবার যদি বাড়ি থেকে একবার বেরুবার সুযোগ পান তাহলে এবার হয়ত সত্যি সত্যি হোটেলে গিয়ে উঠবেন, অথবা হয়ত জাহাজে চড়ে দেশ ছেড়েই চলে যাবেন। বিয়ে করা স্ত্রীর কথাই যার ভুল হয়ে যাচ্ছে, সে-লোক কী যে করে বসবে, তার ঠিক কী?

বড়-অ্যান্টিফোলাস যখন আড্রিয়ানার সঙ্গে বসে খাওয়া-দাওয়া করছেন, ছোট-অ্যান্টিফোলাস তখন রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছোট-ড্রোমিওকে উত্তম-মধ্যম দিচ্ছেন। চাকরটা বলে কী? তিনি আবার কখন বললেন যে হোটেলে গিয়ে খাবেন, আর হোটেলে জমা দেওয়ার জন্য টাকা পাঠিয়েছেন? তিনি কখন বলেছেন যে তাঁর স্ত্রী নেই? এমন বেয়াদবি কথা যে ভৃত্য বলতে পারে, তাকে মারতে মারতে মেরে ফেলাই দরকার।

যা হোক, অনেকটা পরে ছোট-অ্যান্টিফোলাস বাড়ি ফিরলেন। বাড়ির দরজা তখন বন্ধ। কত ডাকাডাকি, হাঁকাহাঁকি ও কড়া নাড়ানাড়ি করলেন, ধাক্কা ও লাথি দিলেন, তবু দোর আর খোলে না। বাড়ির ভিতর থেকে ঝি-চাকরগুলো ঠাট্টা করছে, ভয় দেখাচ্ছে, চোর ডাকাত গুণ্ডা ঠগ বলে গালাগালি দিচ্ছে তাঁকে—নিজেদের মনিবকে। দেবে নাই বা কেন? তারা তো দেখছে—তাদের মনিব ঘরে বসে আহার করছেন তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে। এ-অবস্থায় বাইরে দাঁড়িয়ে একটা লোক যদি নিজেকে এ-বাড়ির মালিক বলে চিৎকার করতে থাকে, তবে তাকে ঠগ বাটপাড় ছাড়া আর কীই বা তারা ভাবতে পারে?

অনেকক্ষণ চেঁচামেচি করেও যখন ছোট-অ্যান্টিফোলাস বাড়ির দরজা খোলাতে পারলেন না, তখন তিনি রাগ করে এক বন্ধুর বাড়ি রওনা হলেন। সেখানেই তিনি খাওয়া-দাওয়া সারবেন।

যাওয়ার সময় পথে স্যাকরা অ্যাঞ্জেলোর সঙ্গে দেখা। এর কাছে তাঁর স্ত্রীর জন্য একগাছা সোনার হার কয়েকদিন আগে তৈরি করতে

দিয়েছিলেন ছোট-অ্যান্টিফোলাস। অ্যাঞ্জেলো তাঁকে জানাল যে হার তৈরী হয়ে গেছে।

স্ত্রীর উপর তখন ছোট-অ্যান্টিফোলাসের বিষম রাগ। তিনি সেই রাগের বশে স্যাকরাকে হার নিয়ে এখনি তাঁর বন্ধুর বাড়িতে আসতে হুকুম করলেন। স্ত্রীকে না দিয়ে তিনি বন্ধুকে হারটা উপহার দেবেন। যে স্ত্রী স্বামীর মুখের উপর বাড়ির দরজা বন্ধ করে দেয়, আর ভিতরে বসে ঝি-চাকর দিয়ে স্বামীকে ঠগ বলে ঠাট্টা করে, সেই বেয়াড়া স্ত্রীকে আবার হার দেওয়া?

স্যাকরা অ্যাঞ্জেলো তখনই সোনার হারটা আনতে হন্তদন্ত হয়ে বাড়ি গেল।

ছোট-অ্যান্টিফোলাস বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে যখন খেতে বসলেন, বড়-অ্যান্টিফোলাস তখন আড্রিয়ানার সঙ্গে বসে খাওয়া শেষ করে ফেলেছেন। আড্রিয়ানার বকাবকিতে কোন কথাই আর বেরোয়নি তার মুখ থেকে, ভুল ভাঙাবার সুযোগ আর তিনি পাননি।

খাওয়ার পরে বড়-অ্যান্টিফোলাস পালিয়ে যাওয়ার মতলব করলেন। কিন্তু পালাবেন কি করে? বাড়ির দরজায় যে কড়া নজর। আড্রিয়ানার ছোট বোন লুসিয়ানার ব্যবহার তাঁর বেশ ভাল লেগেছে। তাই তার সঙ্গে খানিকটা হাসিঠাট্টা করে সময় কাটালেন, এমন কি তার প্রতি তাঁর ভালোবাসা জানালেন ও তাকে বিয়ে করবার প্রস্তাব করলেন। লুসিয়ানা পালিয়ে বাঁচল। নিজের ভগ্নীপতির মুখ থেকে এ ধরনের কথাবার্তা কি করে শোনা যায়? দিদি শুনলে কি ভাববে?

এদিকে বড়-ড্রোমিওকে ধরেছে বাড়ির ঝি লুসী গোপনে। তার সঙ্গে যে লুসীর বিয়ের কথাবার্তা পাকা। লুসীর হাত থেকে কোন মতে পালিয়ে বড়-ড্রোমিও তার মনিব বড়-অ্যান্টিফোলাসের সঙ্গে দেখা করল—দুজন তখন মতলব করে আড্রিয়ানার অজান্তে বাড়ি ছেড়ে পথে বেরিয়ে পড়লেন।

রাস্তায় চলতে চলতে দেখা হল স্যাকরা অ্যাঞ্জেলোর সঙ্গে। অ্যাঞ্জেলো সোনার হার নিয়ে যাচ্ছে ছোট-অ্যান্টিফোলাসের হুকুমে তাঁর বন্ধুর বাড়ি। বড়-অ্যান্টিফোলাসকে দেখেই অ্যাঞ্জেলো হারছড়াটি তাঁর হাতে তুলে দিয়ে পরে এসে দাম নেব বলেই তাড়াতাড়ি চলে গেল নিজের অন্য একটা জরুরী কাজে।

এত তাড়াতাড়ি ব্যাপারটা ঘটে গেল যে বড়-অ্যান্টিফোলাস স্যাকরাকে

কোন কথা জিজ্ঞাসা করবার সময়ই পেলেন না। হার হাতে করে তিনি অবাক্ হয়ে ভাবতে লাগলেন—এটা কি কোন জাতুর দেশ? অতিথি-বিদেশীদের জোর করে বাড়িতে ধরে নিয়ে গিয়ে স্বামী বলে আদর করা ও রাজভোগ খাওয়ানোই কি এখানকার বড়ঘরের মেয়েদের রীতি? অজানা বিদেশীর হাতে সোনার হার গছিয়ে দিয়ে সরে পড়াই কি এখানকার স্যাকরাদের অভ্যাস?

ঝি লুসীর হাতে বড়-ড্রোমিওর ভোগান্তিও কম হয়নি, তার মনেও ঐরকম সন্দেহই উঁকিঝুঁকি মারছিল। এটা যে জাতুর দেশ তাতে তারও সন্দেহ নেই এখন। তখন মনিব-চাকরে মিলে পরামর্শ হল, এখনি এদেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে। বড়-ড্রোমিও তখনই চলে গেল জাহাজঘাটার দিকে। যে-কোন জাহাজ পৃথিবীর যে-কোন দিকে যাক, তাতেই সে মনিবের ও নিজের যাওয়ার বন্দোবস্ত করে ফেলবে। তারপর সেণ্টর থেকে মালপত্র টাকাকড়ি তুলে নিয়ে জাহাজে চড়ে এখান থেকে পালিয়ে বাঁচবে।

এদিকে স্যাকরা অ্যাঞ্জেলোকে পথের মধ্যেই তার এক পুরনো পাওনাদার পাকড়াও করল। তার সঙ্গে আছে সরকারী পেয়াদা। সে বলল, "পাওনা টাকা এখুনি দাও, নইলে জেলে যাও!"

অ্যাঞ্জেলো বলল, "আমার কাছে এখন টাকা কোথায়? তবে অ্যান্টি-ফোলাসকে এইমাত্র আমি একছড়া সোনার হার বিক্রি করেছি। তাঁর বাড়িতে গেলে আমি এখনই হারের দামটা পাব, তাই থেকে তোমায় টাকা দিচ্ছি।"

অ্যাঞ্জেলোর এ-প্রস্তাবে পাওনাদার রাজী হওয়ায় তারা সকলে মিলে ছোট-অ্যান্টিফোলাসের বাড়ির দিকে রওনা হল। ছোট-অ্যান্টিফোলাসকেই তারা পথে দেখতে পেল। তিনি তখন বন্ধুর বাড়িতে পরিতোষ করে খেয়ে ফিরছিলেন।

অ্যাঞ্জেলো বলল, "অ্যান্টিফোলাস মহাশয়! এই দেখুন আমার পাওনাদার আমায় হঠাৎ পাকড়াও করেছে। আমার সোনার হারের দামটা দিয়ে দিন, তা থেকে আমি দেনা শোধ করি।"

ছোট-অ্যান্টিফোলাস বললেন, "নিশ্চয়ই! তোমায় হারের দাম দেব বই কি! কিন্তু হারটা তো আগে দাও।"

"হার!"—আকাশ থেকে পড়ল স্যাকরা!—"আপনি বলছেন কী? হার তো আমি এই কিছুক্ষণ আগে রাস্তায় আপনাকে দিয়ে দিলাম!"

"আমায় দিয়ে দিলে?"—রেগে উঠে বললেন ছোট-অ্যান্টিফোলাস—"মিথ্যাবাদী! হার নিয়ে আমার বন্ধুর বাড়িতে শীঘ্র দেখা করবে বলে খানিকক্ষণ আগে তুমি চলে গেলে, তারপর এই তো তোমার সঙ্গে প্রথম দেখা! দিলে কখন?"

এরপর রাস্তার মাঝে একটা বিশ্রী ঝগড়া শুরু হল। ছোট-অ্যান্টিফোলাস আর অ্যাঞ্জেলো দুজনেই দুজনকে ঠগ জোচ্চোর বলে গালাগালি দিচ্ছেন। অবশেষে অ্যাঞ্জেলো সরকারী পেয়াদাকে বলল, "এ-ভদ্রলোক আমার কাছে দেনদার। আমার নালিশে তুমি এঁকে গ্রেফতার কর, জেলে নিয়ে যাও।"

সেকালে ওসব দেশে এইরকমই আইন ছিল। নালিশ করলেই দেনদার আগে গ্রেফতার হত, তারপর হত মামলা। আর সেই ধরনের গ্রেফতার করবার জন্য আদালতের হুকুমের দরকার ছিল না, পেয়াদারাই পারতো ও কাজটা করতে।

ছোট-দ্রোমিও তার মনিবের সঙ্গেই ছিল।

পেয়াদা গ্রেফতার করে নিয়ে যায় দেখে ছোট-অ্যান্টিফোলাস তাকে পাঠালেন স্ত্রীর কাছে—দুশো মোহর নিয়ে আসবার জন্য। রেহাই পাওয়া যাক, তারপর জোচ্চোর অ্যাঞ্জেলোকে তিনি দেখে নেবেন।

ছোট-দ্রোমিও ছুটে গিয়ে আদ্রিয়ানাকে খবর দিতেই তিনি তখুনি দুশো মোহর বার করে দিলেন স্বামীকে খালাস করবার জন্য। ছোট-দ্রোমিও টাকা নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে কিছুদূর যেতে-না-যেতেই সামনে দেখল বড়-অ্যান্টিফোলাসকে। মনিব বিনা টাকায় কি করে পেয়াদার হাত থেকে খালাস পেলেন তা বুঝতে না পারলেও কথাটি না কয়ে সে সমস্ত টাকা দিয়ে দিল বড়-অ্যান্টিফোলাসকে।

বড়-অ্যান্টিফোলাস তখন বড়-দ্রোমিওকে পাঠিয়েছেন জাহাজঘাটায়। এখন ছোট-দ্রোমিওকে দেখে তাকে নিজের ভৃত্য বলেই মনে করলেন, এবং "গিন্নীমা টাকা পাঠিয়েছেন"—একথা তার মুখ থেকে শুনেই ধরে নিলেন যে, যে-মহিলাটি তাঁকে স্বামী বলে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন, এ তাঁরই নতুন কীর্তি।

ফেরত দিলেই আবার নানা ঝামেলা বাধবে ভেবে টাকাটা তিনি নিলেন এবং ছোট-দ্রোমিওকে হতবাক্ করে দিয়ে হুকুম করলেন—সেণ্টর থেকে মালপত্র নিয়ে তখুনি জাহাজে উঠতে। এ জাদুর রাজ্যে আর এক মুহূর্তও

নয়; অবস্থা ক্রমেই ঘোরালো হয়ে আসছে। রাস্তায় হাজার লোক তাঁকে নমস্কার করছে, কেমন আছেন—জিজ্ঞাসা করেছে, কেউ-বা বাড়িতে এসে পানাহারের জন্য নেমন্তন্ন করেছে। একটা দরজী তাঁকে দোকানে ডেকে নিয়ে দামী দামী কাপড় দেখিয়ে বলেছে—"এসব চমৎকার কাপড় আমি আপনার জন্যই আমদানি করেছি; আপনি ছাড়া এ-কাপড়ের জামা পরবার মত লোক এ-শহরে আর কটাই বা আছে?—এই বলে তাঁর গায়ের মাপ নিয়ে তবে তাঁকে ছেড়ে দিয়েছে।

সেণ্টর থেকে মাল নিয়ে জাহাজে উঠতে হবে? আবার সেই কথা? ছোট-ড্রোমিওর মনে এবার আর একটুও সন্দেহ রইল না যে তার মনিবের মাথা একদম খারাপ হয়ে গেছে। সেণ্টরে যাবার নাম করে গিন্নীমার কাছে ছুটে গিয়ে তাঁকে জানাল মনিবের পাগল হয়ে যাওয়ার কথা। আড্রিয়ানাও সঙ্গে সঙ্গে স্বামীর খোঁজে বেরিয়ে পড়লেন তাঁর ছোটবোন লুসিয়ানাকে নিয়ে।

তাঁরা রাস্তায় ছোট-অ্যান্টিফোলাসের দেখা পেলেন। টাকা না পাওয়ায় পেয়াদা তাঁকে তখন জেলখানায় নিয়ে যাচ্ছে। স্ত্রীকে দেখে, ছোট-অ্যান্টি-ফোলাস যাচ্ছেতাই করে গালাগাল দিতে লাগলেন, বললেন—"তুমি আমায় বাড়িতে ঢুকতে দাওনি খাওয়ার সময়। তুমি আমায় টাকা পাঠাওনি আমার গ্রেফতারের খবর পেয়েও। এই কি স্বামীর প্রতি স্ত্রীর ব্যবহার? তোমার নরকেও স্থান হবে না। আমি ডিউকের কাছে নালিশ করব তোমার নামে।"

এসব অভিযোগ শুনে আড্রিয়ানা এবং লুসিয়ানার মনে আর তিলমাত্র সন্দেহ রইল না যে অ্যান্টিফোলাস পাগল হয়ে গেছেন। খাওয়ার সময়ে তো স্বামীর পাশে বসেই খেয়েছেন আড্রিয়ানা; আর ড্রোমিও তো এইমাত্র বাড়ি গিয়ে খবর দিল যে, সে মনিবের হাতে টাকা গুঁজে দিয়ে এসেছে।

এখন এই পাগলকে বাড়ি নিয়ে যাওয়া দরকার!

আড্রিয়ানার যে প্রচুর টাকা, তা শহরের সবাই জানে। "টাকা আমি বাড়ি গিয়েই পাঠিয়ে দিচ্ছি"—একথা শুনেই পেয়াদা ছোট-অ্যান্টিফোলাসকে ছেড়ে দিল। তখন রাস্তা থেকে লোক ডেকে আড্রিয়ানা বেঁধে ফেললেন স্বামীকে, আর বাড়িতে নিয়ে তাঁকে ঘরে বন্ধ করে ওঝা ডাকলেন তাঁর চিকিৎসার জন্য। পাগলের চিকিৎসা বলতে তখনকার দিনে ওঝার ঝাড়ফুঁক ছাড়া আর কিছু ছিল না।

স্বামীকে ওঝার হাতে তুলে দিয়ে আদ্রিয়ানা আবার বেরুলেন অ্যাঞ্জেলোর দেনা শোধ করবার জন্য। কিছুদূর গিয়ে বড়-অ্যান্টিফোলাসকে দেখেই তাঁর চক্ষুস্থির। আদ্রিয়ানা মনে করলেন—তাঁর স্বামী কোনরকমে ওঝার হাত ছাড়িয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে রাস্তায় এসে পড়েছেন আবার।

বড়-অ্যান্টিফোলাসেরও পাগলের মতই মূর্তি তখন। শহরের লোকে শুনেছে অ্যান্টিফোলাস পাগল হয়েছেন। তাই বড়-অ্যান্টিফোলাস শহরের যেখানেই গেছেন, সবাই তাঁকে ধরবার চেষ্টা করেছে। তাঁকে বেঁধে বাড়ি পাঠিয়ে দেবে—এই তাদের মতলব। বড়-অ্যান্টিফোলাস তাই যেখানেই যাচ্ছেন, তরোয়াল বার করে নিজেকে রক্ষা করতে হচ্ছে তাঁকে। তাঁর ভৃত্য বড়-ড্রোমিও সঙ্গে আছে, সেও তরোয়াল খুলে প্রভুর সঙ্গে চলেছে।

আদ্রিয়ানা আবার লোকজন ডাকতে লাগলেন স্বামীকে বাঁধবার জন্য। নিরুপায় হয়ে বড়-অ্যান্টিফোলাস বড়-ড্রোমিওকে নিয়ে নিকটে যে-বাড়িটা পেলেন তারই ভিতর ঢুকে পড়লেন আশ্রয় চাইবার জন্য। বাড়িটি একটি মঠ। মঠের যিনি ঠাকুরানী, তিনি এক বুড়ী মহিলা, ধর্ম-কর্ম নিয়েই আছেন সারাজীবন। তিনি বাইরে বেরিয়ে এসে আদ্রিয়ানাকে বললেন, "মঠে যারা আশ্রয় নেয় তাদের জোর করে ধরে নিয়ে যাওয়ার অধিকার কারও নেই; তোমরা চলে যাও!"

আদ্রিয়ানা রেগে উঠে বললেন, "কিন্তু পাগলের বেলায় তো ওসব নিয়ম খাটে না! আমার স্বামী পাগল হয়েছেন, আমি তাঁকে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করাব। ছেড়ে দিন তাঁকে আপনি।"

কিন্তু মঠের ঠাকুরানীর বিশ্বাস হয়েছে যে, তাঁর কাছে যে-ছেলেটি আশ্রয় নিয়েছে, সে পাগল নয়। এ মেয়েটি তাকে নিজের পাগল স্বামী বলে দাবি করছে বটে, কিন্তু তাঁর ধারণা কোথাও ভয়ানক ভুলচুক হয়েছে একটা। তাই তিনি কিছুতেই বড়-অ্যান্টিফোলাসকে আদ্রিয়ানার হাতে তুলে দিতে রাজী হলেন না।

ওদিকে তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। মহামান্য ডিউক আদেশ দিয়েছিলেন যে ইজিয়নের জরিমানা যদি সারাদিনের ভিতর আদায় না হয়, তাহলে সন্ধ্যাবেলায় তাঁর মাথা কাটা হবে। যে-জায়গায় লোকের মাথা কাটা হয়ে থাকে, সেদিকে যাওয়ার রাস্তা গেছে মঠের পাশ দিয়েই।

আগে আগে চলেছে ঘাতক ইজিয়নকে নিয়ে। পিছনে আসছেন ডিউক —তাঁর সঙ্গে অনেক কর্মচারী। ঠিক সেই সময়ে আদ্রিয়ানা এসে ডিউকের

কাছে নালিশ করলেন যে তাঁর পাগল স্বামীকে মঠের ঠাকুরানী কিছুতেই মঠ থেকে বার করে দিচ্ছেন না।

আদ্রিয়ানার কথা শুনে খুবই দুঃখিত হলেন ডিউক। অ্যান্টিফোলাস তাঁর প্রিয়পাত্র, তার বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে আদ্রিয়ানার সঙ্গে তিনিই তার বিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি মঠের ঠাকুরানীকে বললেন, "অ্যান্টিফোলাসকে বাইরে নিয়ে আসুন, আমি দেখব তাকে।"

মঠের ঠাকুরানী তাঁর আশ্রিতদের আনতে গেলেন।

আর ঠিক তখনই রাস্তার অন্যদিক্ থেকে ছুটতে ছুটতে এসে পড়লেন ছোট-অ্যান্টিফোলাস তাঁর ভৃত্য ছোট-ড্রোমিওকে সঙ্গে নিয়ে। কোনমতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে তিনি আদ্রিয়ানার খোঁজে ছুটে বেরিয়েছেন একটা বোঝাপড়া করবার জন্য।

ওদিকে মঠের ঠাকুরানীর সঙ্গে ভিতর থেকে বেরিয়ে এল বড়-অ্যান্টিফোলাস এবং বড়-ড্রোমিও।

তখন কারও মুখেই আর কোন কথা নেই। এমন অদ্ভুত ব্যাপার পৃথিবীতে কেউ কখনও দেখেনি। আদ্রিয়ানা দেখেন—তাঁর দুই স্বামী; বড়-ড্রোমিও ও ছোট-ড্রোমিও দেখে—তাদের প্রত্যেকের দুই মনিব; বড়-অ্যান্টিফোলাস এবং ছোট-অ্যান্টিফোলাস দেখেন—তাঁদের প্রত্যেকের দুইজন চাকর। আর—আর—

ইজিয়ন দেখেন—তাঁর দুই ছেলে!

তাঁর চিৎকার শুনে সেদিকে তাকাতেই বড়-অ্যান্টিফোলাস তখনই নিজের পিতা বলে তাঁকে চিনতে পারলেন। বড়-ড্রোমিও চিনতে পারল তার বুড়ো মনিবকে।

ছোট-অ্যান্টিফোলাসকেও ইজিয়ন নিজের পরিচয় দিয়ে পুরোনো দিনের কথাগুলো বললেন। এতকাল পরে বাবাকে ফিরে পেয়ে ছোট-অ্যান্টিফোলাসের আনন্দ আর ধরে না।

এঁদের এই সুখের মিলন দেখে ডিউক এমনই আনন্দিত হলেন যে ইজিয়নের জরিমানা মাফ করে তিনি তাঁকে মুক্তি দিলেন। আদ্রিয়ানার সঙ্গে তাঁর স্বামীর ঝগড়া মিটে গেল; লুসিয়ানার সঙ্গে বড়-অ্যান্টিফোলাসের বিয়ে হবে—এই রকম একটা কথাও পাকা হল।

মঠের বুড়ী ঠাকুরানী এতক্ষণ অবাক্ হয়ে এই ব্যাপার দেখছিলেন।



রোজালিণ্ড নিজের রত্নহার বিজয়ী ওর্লাণ্ডোর গলায় পরিয়ে দিল।

অদৃষ্টের কি পরিহাস! এতদিন বাদে নিজের স্বামীকে দেখতে পেলেন, আর পেলেন দুই ছেলেকে! আনন্দের একটা রেশ তাঁর মুখে ফুটে উঠল। তিনি সকলের সামনে এগিয়ে এসে নিজের পরিচয় দিলেন ইজিয়নের হারানো স্ত্রী আমেলিয়া বলে। মঠের ঠাকুরানীর বেশে আমেলিয়া আছেন বলে ইজিয়ন এতক্ষণ তাঁর স্ত্রীকে চিনতেই পারেন নি। এবার পরিচয় শোনামাত্র ভালভাবে নজর দিতেই আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন তিনি।

হাঁ, হাঁ, এইবার তিনি সকলকেই ফিরে পেয়েছেন—মনে মনে ভগবানকে প্রণাম জানালেন তিনি।

———



উইন্টার্স টেল

সিসিলিয়ার রাজা লিয়ন্তিস আর বোহেমিয়ার রাজা পলিক্সেনিস ছেলেবেলায় একই বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করে বহুবৎসর একসঙ্গে কাটিয়ে পরস্পরের সত্যিকার বন্ধু হয়ে উঠেছিলেন। ছেলেবেলা থেকে তাঁদের মধ্যে যে গভীর ভালবাসা জন্মেছিল, তা সিংহাসনে বসবার পরও নষ্ট হয়নি। দূরে থাকায় দেখাসাক্ষাৎ হত না বটে তাদের মধ্যে কিন্তু ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বরাবর ছিল। দামী দামী উপহার আর তাঁদের ভালবাসায় ভরা চিঠিপত্র বহন করে বোহেমিয়ার রাজদূত সিসিলিয়ায়, আর সিসিলিয়ার রাজদূত বোহেমিয়ায় ঘন ঘন যাতায়াত করতে থাকে।

লিয়ন্তিস ও পলিক্সেনিস দুজনেই যথাসময়ে বিয়ে করেছেন, কিন্তু বিয়ের কয়েকবছরের মধ্যে পলিক্সেনিসের রানী একটি ছেলে রেখে মারা যান। পলিক্সেনিস আর বিয়ে করেননি—তাঁর একমাত্র ছেলে ফ্লোরিজেলকে নিয়ে ভবিষ্যতের জল্পনা-কল্পনা করছেন। লিয়ন্তিসেরও এক ছেলে হয়েছে, তার নাম ম্যামিলিয়াস।

সিসিলিয়ায় এসে কয়েকমাস কাটিয়ে যাওয়ার জন্য লিয়ন্তিস বহুবার অনুরোধ করেছেন তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু পলিক্সেনিসকে, কিন্তু নিজের রাজ্য ছেড়ে যাওয়ায় বিশেষ অসুবিধা ছিল বলে পলিক্সেনিস বন্ধুর সাদর অনুরোধ এতদিন বার বার উপেক্ষা করতে বাধ্য হয়েছেন।

কিন্তু স্ত্রীর মৃত্যুর পর পলিক্সেনিসের মনের অবস্থা এত শোচনীয় হল যে রাজ্যে থেকেও রাজ্যশাসনের কাজ তিনি কিছুই করতে পারছেন না।

তাই সিসিলিয়ায় যাবার অনুরোধ লিয়ন্তিসের কাছ থেকে আবার পেয়ে পলিক্সেনিস মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করতে বসলেন। মন্ত্রীরা সবাই একমত যে কিছুদিন বাইরে ঘুরে এলে রাজার মনটা চাঙ্গা হয়ে উঠতে পারে, আর ফিরে এসে কাজে-কর্মে মন দেওয়া রাজার পক্ষে হয়ত সহজ হবে। মন্ত্রীদের পরামর্শে পলিক্সেনিস এবার বন্ধুর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে বসলেন। বহু লোকজন নিয়ে একদিন বোহেমিয়ার জাহাজ রওনা হল সিসিলিয়ার দিকে।

লিয়ন্তিস, তাঁর রানী হার্মিয়োন, মন্ত্রী, পারিষদ, বান্ধবগণ সবাই বন্দরে এসে অভ্যর্থনা করলেন বোহেমিয়ার রাজা পলিক্সেনিসকে। রাজ্যময় পড়ে গেল আনন্দের সাড়া। বহুদিন বাদে লিয়ন্তিসের সঙ্গে পলিক্সেনিসের দেখা হতেই সে-যুগের শিশুমন তুটিও যেন আবার জোড়া লাগল!

কখনো হাসি, কখনো চোখের জলের ভিতর দিয়ে তুই বন্ধু পরস্পরের সঙ্গে ছেলেবেলাকার সুখের দিনের কথা নতুন করে ঝালিয়ে তুলে নানা আনন্দ উপভোগ করতে লাগলেন। রাজপ্রাসাদে শুরু হল একটানা উৎসবের বান। ভোজ, নাচ, শিকার, হাসি-খুশীর আয়োজন সেখানে অফুরন্ত।

বেশ কয়েকমাস সুখে কাটাবার পর লিয়ন্তিসকে একদিন পলিক্সেনিস বললেন, "আর নয় বন্ধু, এবার বিদায় দাও।"

বিদায় দেওয়া কি সহজ? পলিক্সেনিসকে পেয়ে লিয়ন্তিস যেন তাঁর হারানো কৈশোরকে ফিরে পেয়েছেন আবার। তিনি বললেন, "এ মাসটা যাক্!" বন্ধুর কাতর অনুনয়ে পলিক্সেনিস আরও একমাস থেকে গেলেন। আবার তিনি বিদায় চাইলে লিয়ন্তিস বললেন, "যাক্ না এ হপ্তাটা!" এভাবে কয়েকবার লিয়ন্তিস তাঁর বন্ধু পলিক্সেনিসের দেশে ফিরে যাওয়া বন্ধ করলেন। শেষবারে তিনি মিনতি করলেন, "কালকের দিনটা অন্ততঃ থেকে যাও বন্ধু!"

পলিক্সেনিস দেশে রওনা হওয়ার দিন ঠিক করে ফেলেছেন, কোনমতেই তা বাতিল করবেন না বলে সংকল্প করেছেন। তাই এবার লিয়ন্তিসের অনুরোধ রাখতে পারলেন না পলিক্সেনিস, কাতর হয়ে তাঁকে বললেন, "না বন্ধু আর আমায় এখানে থাকতে বলো না। আগামী কাল ভোরেই আমায় অবশ্যই দেশে রওনা হতে হবে।"

লিয়ন্তিস তখন তাঁর স্ত্রী হার্মিয়োনকে বললেন, "আমার কথায় তো

এবার কোন কাজ হল না। তুমি একবার আবার বন্ধুকে অনুরোধ করে দেখ। আগামী কাল আমি বন্ধুকে ছাড়তেই পারি না। তার জন্য আমোদপ্রমোদের একটা বিশেষ ব্যবস্থা আগে থেকেই করে রেখেছি যে !"

স্বামীর অনুরোধেই হার্মিয়োন পলিক্সেনিসকে আরও দুটো দিন থেকে যেতে অনুরোধ করলেন।

পলিক্সেনিস পড়লেন মহা ফাঁপরে। বন্ধুর অনুরোধ বহুবার তিনি রেখেছেন, এখন তাঁর অনুরোধ না রাখলেও তাতে দোষের কিছুই হবে না। কিন্তু বন্ধুর স্ত্রী তো তাঁকে কোনদিন কোন অনুরোধ করেননি এর আগে। হার্মিয়োন-এর প্রথম অনুরোধ অগ্রাহ্য করতে তাঁর ভদ্রতায় বাধল। এক-কথাতেই তিনি আরও দু' একদিন থেকে যেতে রাজী হলেন।

বন্ধুর অনুরোধের চেয়ে বন্ধুর স্ত্রীর অনুরোধকে বেশী মূল্য দিয়েছেন শুনে লিয়ন্তিসের মনে গভীর সন্দেহ হল যে বহুদিন এক জায়গায় মেলামেশার ফলে হার্মিয়োনের সাথে পলিক্সেনিসের অবৈধ ভালবাসা জন্মেছে, তা নইলে এ রকমটা হল কেন ? তাঁর মনে পলিক্সেনিসের আর হার্মিয়োনের অপরাধ সম্বন্ধে একটুও সংশয় রইল না। এক মুহূর্তে সব কিছু ওলটপালট হয়ে গেল তাঁর মাথার ভিতরে। তিনি ভুলে গেলেন—পলিক্সেনিসের সঙ্গে তাঁর বহুদিনের নিবিড় বন্ধুত্ব ও গভীর ভালবাসার কথা। পলিক্সেনিসকে তিনি ভাবলেন বেইমান চরিত্রহীন, আর পতিব্রতা স্ত্রী হার্মিয়োনকে ভাবলেন চরিত্রহীনা।

এই রকম ধারণা মাথায় ঢুকতেই হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন লিয়ন্তিস। যাঁকে এত অনুনয় করে দুটো দিন আরও থেকে যেতে রাজী করিয়েছেন, তাঁর সঙ্গে আর যেন তিনি সাধারণ ভদ্র ব্যবহার করতেও পেরে উঠছেন না।

যতই চিন্তা করেন, ততই যেন ক্ষেপে ওঠেন লিয়ন্তিস। তাঁর স্ত্রী বিশ্বাসঘাতিনী ? তাঁর বন্ধু বিশ্বাসঘাতক ? লিয়ন্তিস যাঁকে অতিথি বলে আদর করে অন্তঃপুরে ঠাঁই দিয়েছেন, সেই কিনা এতখানি নীচতার পরিচয় দিল ? সেই কিনা ভুলে গেল সারা জীবনের বন্ধুত্বের কথা ? লিয়ন্তিসের অন্তর ক্রোধে জ্বলে উঠল, নিজের উপর এল ধিক্কার, আর বন্ধুর রক্ত দেখার জন্য চাপল দারুণ একটা জেদ। তিনি মনস্থির করলেন—যে-দোষ ওরা করেছে, তার উপযুক্ত শাস্তি দিতেই হবে।

ক্যামিলো নামে তাঁর অতিবিশ্বাসী এক পারিষদ ছিলেন। খুব উঁচু

বংশের মানী লোক তিনি। লিয়ন্তিস সেই ক্যামিলোকে বললেন তাঁর অন্তরের কথা। কঠিন সাজা দিতে হবে পলিক্সেনিসকে। জীবন নিয়ে তাঁকে সিসিলিয়া থেকে ফিরতে দেওয়া হবে না।

ক্যামিলোর উপর ভার দিলেন লিয়ন্তিস পলিক্সেনিসকে হত্যা করবার জন্য। বিষ খাইয়ে মেরে ফেলাই ভাল, কেউ কিছু জানতে পারবে না।

রাজার আদেশ শুনে ক্যামিলোর তো মাথায় বাজ পড়ল যেন। কিন্তু লোকটি বিবেচক। সরাসরি আপত্তি করলে বা আদেশ-পালনে অস্বীকার করলে ফল ভাল হবে বলে তিনি মনে করলেন না। তিনি দেখলেন—লিয়ন্তিসের এখন মাথার ঠিক নেই। কোন যুক্তিই তাঁর ভাল বলে মনে হবে না। কোন পরামর্শেই তাঁর সুবুদ্ধির উদয় হবে না। দারুণ একটা ঈর্ষায় তাঁর বুদ্ধিলোপ ঘটেছে। তর্ক করতে গেলে সেই ঈর্ষা হয়ত আরও প্রবল হয়ে উঠবে। ক্যামিলো রাজী না হলে রাজা হয়ত অন্য কোন ব্যক্তিকে ঘাতকের কাজে নিয়োজিত করবেন। সে-ব্যক্তি হয়ত ইতস্ততঃ না করে রাজার আদেশ পালন করবে—অতিথির রক্তে কলঙ্কিত হবে সিসিলিয়া রাজবংশের ইতিহাস।

ক্যামিলো তাই কোন আপত্তি না তুলে আদেশ পালন করতে রাজী হয়ে গেলেন। লিয়ন্তিসও নিশ্চিন্ত হলেন।

পলিক্সেনিসের সঙ্গে ক্যামিলোর দেখা হতেই তিনি তাঁকে সেই রাতেই পালিয়ে যাবার পরামর্শ দিলেন। তাঁর বহুদিনের পুরোনো বন্ধু যে এত শীঘ্র এবং এত অকারণে এমন প্রাণঘাতী শত্রু হয়ে দাঁড়াতে পারে, এটা তিনি বিশ্বাসই করতে পারলেন না। কিন্তু লিয়ন্তিসের ব্যবহারে সৌজন্যের একান্ত অভাব কিছু আগেই লক্ষ্য করেছেন পলিক্সেনিস। এখন ক্যামিলোর মুখে তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রের কথা শুনে সহজেই তাঁর বিশ্বাস হল।

ক্যামিলো শুধু গোপনে খবরটা দিয়েই নিশ্চিন্ত হন নি, পলিক্সেনিসকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করবার উপায়ও তিনি ঠিক করেছেন। সেই রাতেই পলিক্সেনিসকে সিসিলিয়া থেকে পালাতে হবে। তাঁর জাহাজ আছে বন্দরে। নিঃশব্দে রাতের আঁধারে তাঁর সহচর অনুচরেরা সবাই দু তিন জন করে আলাদা আলাদা দলে শহর থেকে বেরিয়ে যাবে। তারপর নিঃশব্দে উঠে বসবে নিজেদের জাহাজে। শহরের সব প্রবেশপথের দেখাশোনার ভার ক্যামিলোরই উপরে। তিনি প্রত্যেক পথে রক্ষীদের হুকুম দিয়ে রাখলেন যাতে বোহেমিয়ার দলের কাউকে তারা আটক না করে।

সেভাবেই সব ব্যবস্থা হল। দু তিন জনের ছোট ছোট দলে ক্রমে ক্রমে বোহেমিয়াবাসীরা রাতের আঁধারে শহর থেকে বেরিয়ে গেল। সাধারণ গরিব লোকের মত পোশাক পরে বেরিয়ে গেলেন পলিক্সেনিস নিজেও। পলিক্সেনিসকে হত্যা না করে নিরাপদে পালাবার সুযোগ দেওয়ার অপরাধে লিয়ন্তিস নিশ্চয়ই ক্যামিলোর প্রাণদণ্ড দেবেন, এই ভয়ে ক্যামিলো নিজেও সিসিলিয়া ছেড়ে পলিক্সেনিসের সাথে বোহেমিয়াতেই চলে গেলেন।

পরের দিন ভোরেই ক্যামিলোর সহায়তায় পলিক্সেনিসের পালানোর খবরটা জানতে পারলেন লিয়ন্তিস। শুনে তিনি যেন রেগে পাগলের মত হয়ে উঠলেন। ক্যামিলোকে হাতে পেলে তিনি বোধ হয় সেই মুহূর্তে জ্বলন্ত আগুনে ছুঁড়ে ফেলে দিতেন। কিন্তু ক্যামিলো তাঁর নাগালের বাইরে, আর পলিক্সেনিস নিজের রাজ্যে চলে গেছেন। তখন প্রতিহিংসায় অন্ধ হয়ে তাঁর সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল রানী হার্মিয়োনের উপর। এই নারীই হল সকল অনিষ্টের মূল, সবচেয়ে পাপী ঐ হার্মিয়োনই। যা মুখে এল, তাই বলে হার্মিয়োনকে তিরস্কার করলেন রাজা। তারপর তাঁকে পাঠালেন কারাগারে।

অভাগিনী রানী হার্মিয়োন! তিনি ভেবেই পান না—বিনা দোষে কেন তাঁর এই সাজা! কোন্ দেবতার রোষে তাঁর সুখের ঘরে অকস্মাৎ বাজ পড়ল! কারাগারে বসে বসে তিনি অঝোরে চোখের জল ফেলেন, আর দেবতাদের দয়া ভিক্ষা করেন।

রাজ্যের সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত লোকেরা বিশ্বাসই করেন না যে রানীর সত্যসত্যই কোন অপরাধ আছে। তাঁরা দুজন অতিবিশ্বাসী সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোককে পাঠালেন পবিত্র ডেলফি নগরে সূর্যদেবতা অ্যাপোলোর মন্দিরে। তখনকার দিনের লোকেরা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করত যে ওই সূর্যদেবতার মন্দিরে ধরনা দিলে দেবতার মুখ থেকে সত্য কথা শুনতে পাওয়া যায়। এই অতিবিশ্বাসী সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক দুজন রানী চরিত্রহীনা কিনা এ বিষয়ে সূর্যমন্দিরে দেবতার বাণী নিয়ে ফিরে আসবেন।

রাজার কিন্তু দৃঢ় বিশ্বাস যে রানী অবিশ্বাসিনী। ডেলফি থেকে দেবতার কি বাণী আসে, তার জন্য তিনি দেরি করবার প্রয়োজন আছে বলে মনে করলেন না। তিনি ঘোষণা করে দিলেন যে প্রকাশ্য সভায় রানীর বিচার হবে। রাজা নিজেই রানীর নামে অভিযোগ নিয়ে আসবেন।

কিন্তু বিচারদিনের পূর্বেই রানী কারাগারে এক কন্যাসন্তান প্রসব করলেন। রাজার সন্দেহ এবং ক্রোধ দ্বিগুণ বেড়ে গেল। সন্দেহ এই যে রানীর এ-সন্তান তাঁর নিজের নয়। তিনি মেয়েকে দেখতে কারাগারে গেলেন না।

রাজার আশেপাশে যাঁরা ঘোরাফেরা করেন, তাঁদের ভিতর ছিলেন অ্যান্টিগোনাস একজন। তাঁর স্ত্রী পলিনা রানীকে বড়ই ভালবাসেন। সুদিনে রানীর ভালবাসা তিনি পেয়েছিলেন, এই দুর্দিনে তিনি রানীকে ভুলতে পারেননি। কারাগারে গিয়ে তিনি রানীর কাছ থেকে সদ্যোজাত মেয়েটিকে চেয়ে নিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য, রাজার কাছে মেয়েটিকে নিয়ে যাবেন। তাঁর আশা এই যে কচি মেয়ের সুন্দর মুখখানি দেখলে লিয়ন্তিসের কঠিন প্রাণও হয়তো গলে যাবে।

রাজা কিন্তু মেয়েকে দেখে আগুনের মত জ্বলে উঠলেন। অ্যান্টিগোনাসকে আদেশ করলেন মেয়েকে তখনি মেরে ফেলতে। রাজসভার গণ্যমান্য লোকেরা ত রাজার সে হুকুম শুনে একেবারে থ। তাঁরা সকলে মিলে এমনভাবে রাজাকে অনুনয় করতে শুরু করলেন যে রাজা নিজের মেয়ের মৃত্যুদণ্ড বাতিল করে ওকে কোন নির্জন দেশে ফেলে দিয়ে আসবার হুকুম দিলেন। অবশ্য তাতেও যদি মৃত্যু হয় মেয়েটার তো তিনি নাচার!

রানী এবং রানীর মেয়ের উপর রাজার দয়া আকর্ষণের জন্য যেসব কথা বললেন পলিনা, তার জন্য রাজা তাঁকে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করলেন। অ্যান্টিগোনাসও স্ত্রীর মনোভাবের প্রতি একটুও দরদ দেখালেন না; বরং রাজার হুকুম তামিল করবার জন্য মেয়েটিকে পলিনার কোল থেকে কেড়ে নিয়ে চলে গেলেন কোন বিজন প্রদেশে তাকে ফেলে রেখে আসবার জন্য।

কারাগারে বসে হার্মিয়োন শুনলেন পলিনার সমস্ত চেষ্টার ফলাফল। নিষ্পাপ মেয়ে তার পিতার অবিচারে মরণের সাজা পেল, এ-দুঃখ অভাগী-মা কেমন করে সইবেন? তিনি শুনে অবধি বারবার মূর্ছিত হয়ে পড়তে লাগলেন।

অবশেষে এল সেই বিচারের দিন। প্রকাশ্য আদালতে হাজির হয়ে রাজা এই বলে নালিশ করলেন যে তাঁর স্ত্রী অসতী। রানীও কাঁদতে কাঁদতে অস্বীকার করলেন সে-অভিযোগ। বিচারকগণ হয়ত রাজার মনোমত সাজাই রানীকে দিতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু এই সময়ে সূর্যদেবতার

বাণী নিয়ে সেই দুজন অতিবিশ্বাসী সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক রাজধানীতে ফিরে এলেন। তাঁরা এসেই বিচারকগণের হাতে দিলেন একটা চিঠি। পবিত্র ডেল্‌ফির মন্দিরের প্রধান পুরোহিতের সহিমোহরযুক্ত এই চিঠি। সকলের সামনে বিচারকেরা মোহর ভেঙে চিঠি পড়লেন। চিঠিতে লেখা আছে—

"হার্মিয়োন নিষ্পাপ, পলিক্সেনিস নিষ্পাপ, সদ্যোজাত শিশুটি লিয়ন্তিসেরই মেয়ে, এবং হারিয়ে যাওয়ার পর সেই মেয়েকে যদি আবার ফিরে না পাওয়া যায়, তাহলে রাজার মৃত্যুর পরে সিংহাসনে বসবার আর কেউই থাকবে না।"

একমাত্র রাজা লিয়ন্তিস ছাড়া সবাই দেবতার বাণী শুনে খুশী হল। সবাই অন্তরে অন্তরে সুশীলা মিষ্টভাষিণী হার্মিয়োনকে ভালবাসত। লিয়ন্তিস এবার প্রকাশ্যে ডেল্‌ফির দেবতার বাণীকে একেবারে অবিশ্বাস করলেন, বললেন—"ওটা মিথ্যা, ওটা জাল। দেখ না, কী-রকম বাজে কথা লিখেছে! হারানো মেয়েটিকে ফিরে না পেলে আমার সিংহাসনে বসবার কেউ থাকবে না। এ-কথার কোন মানে হয়? সিংহাসনে বসার জন্য তো আমার ছেলে ম্যামিলিয়াসই রয়েছে।"

রাজার মুখের কথাটা শেষ হতে না হতেই রাজবাড়ির একজন রক্ষী দৌড়ে এসে প্রবেশ করল বিচারালয়ে। প্রবেশ করেই সে তারস্বরে চিৎকার করল, "মহারাজ! মহারাজ! যুবরাজ ম্যামিলিয়াস হঠাৎ মারা গেছেন।"

সভাসুদ্ধ লোকের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। একটা আর্তচিৎকার করে রানী হার্মিয়োন মূর্ছিত হয়ে পড়লেন।

রানীকে কারাগারে পাঠাবার পর বালক রাজপুত্র মায়ের বিচ্ছেদ সইতে পারেননি। সে অসুস্থ হয়ে পড়ল। কিন্তু সে অসুখ এমন কিছু বাড়াবাড়ি নয়, যাতে কারও মনে কোন ভয় বা দুশ্চিন্তা হতে পারে। আজ হঠাৎ যেন রানীর চরিত্র নিষ্কলুষ প্রমাণ করার জন্য এবং রাজার অহংকার গুঁড়িয়ে দেবার জন্যই সূর্যদেবতা তার জীবনটা কেড়ে নিলেন।

রাজার অহংকার একেবারে গুঁড়িয়ে গেল। ছেলের মৃত্যুতে হাতেনাতে প্রমাণ হয়ে গেল যে সূর্যদেবতার বাণী নির্ভেজাল সত্য। লিয়ন্তিস বুঝতে পারলেন যে হার্মিয়োন ও পলিক্সেনিস একেবারে নির্দোষ—তিনি অকারণ ঈর্ষার বশে তাঁদের সন্দেহ করেছিলেন।

কিন্তু হার্মিয়োন সেই যে অচেতন হয়ে পড়েছিলেন, তাঁর জ্ঞান আর

ফিরে আসে না। পলিনা বললেন, রানীকে তিনি নিজের বাড়িতে নিয়ে শুশ্রূষা করতে চান। কারণ রাজপ্রাসাদে নিয়ে গেলে ছেলের মৃত্যু এবং স্বামীর নিষ্ঠুরতার কথা মনে করে তিনি কেবল দুঃখ পেতে থাকবেন, তাতে তাঁর সুস্থ হয়ে উঠবার কোন আশাই থাকবে না। রাজা তখন দুঃখে, শোকে ও লজ্জায় একেবারে মুষড়ে পড়েছেন, পলিনার এ-প্রস্তাবে আপত্তি করার কোন যুক্তিই তাঁর মাথায় এল না।

পলিনা হার্মিয়োনকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন, এবং অল্পক্ষণ পরেই রাজাকে খবর পাঠালেন যে হার্মিয়োনের আর জ্ঞান ফিরে আসেনি। অজ্ঞান অবস্থাতেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

অভাগা লিয়ন্তিস হতভম্বের মত শূন্যে তাকিয়ে রইলেন নীরবে। তাঁর একটা ভুলে সোনার সংসার আগুনে পুড়ে খাক হয়ে গেল! ছেলে গেল, মেয়ে গেল, বউ গেল, বন্ধু গেল—পৃথিবীতে তাঁর মত পোড়াকপাল আর কার? বুকের ভিতর যেন আগুন জ্বলে ওঠে অভাগা লিয়ন্তিসের।

* * *

অ্যান্টিগোনাস একখানি নৌকায় করে শিশু-রাজকন্যাকে নিয়ে যাচ্ছিলেন। বোহেমিয়ার কোন এক জায়গায় তাকে ফেলে রেখে আসাই তাঁর ইচ্ছা। অ্যান্টিগোনাসও রাজারই মত সন্দেহ করেছেন—শিশু-কন্যাটি পলিক্সেনিসের কন্যা। সে-অবস্থায় মেয়েটিকে তার আসল পিতার দেশে ফেলে রেখে আসাই উচিত হবে।

অ্যান্টিগোনাসের নৌকা বোহেমিয়ার উপকূলে যখন পৌঁছল, তখন নিবিড় মেঘ আকাশ কালো করে এল। অ্যান্টিগোনাস তাড়াতাড়ি তীরে নেমে মেয়েটিকে একজায়গায় মাটিতে নামিয়ে রাখলেন। সোনার বিনিময়ে যদি কোন সদাশয় লোক মেয়েটির লালনপালনের ভার নেয়, সেই আশায় মেয়েটির পাশে রাখলেন একটি পুঁটলিতে একরাশি সোনার মোহর।

জনমানবহীন সাগরতীরে মেয়েটিকে শুইয়ে রেখে অ্যান্টিগোনাস নৌকায় উঠতে যাবেন, এমন সময় তাঁরও শেষ সময় ঘনিয়ে এল। বোহেমিয়ার ঐ অঞ্চলে ভয়ানক জন্তু-জানোয়ারের উৎপাত। এক ভল্লুক এসে হঠাৎ আক্রমণ করল অ্যান্টিগোনাসকে। তিনি আর নৌকায় উঠবার সময় পেলেন না, ভল্লুক সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে মেরে ফেলল।

আর ঠিক সেই সময়ে উঠল দারুণ ঝড়। নৌকাখানি ডুবে গেল এবং

উথাল-পাথাল ঢেউ ঠেলে ঠেলে নৌকার মাঝিরাও কেউ তীরে উঠতে পারল না।

সিসিলিয়ার রাজকন্যাকে এই বিশাল ধরণীর বুকে যে কোথায় ফেলে আসা হল, তার অভাগা পিতাকে সে-কথা বলে দেবার জন্য একটি প্রাণীও জীবিত রইল না।

অ্যান্টিগোনাস ফিরে এলেন না দেখে লিয়ন্তিস মনে করলেন—পাপের সাজা সে হাতে হাতেই পেয়েছে। দেবতার রোষে নিষ্পাপ মেয়ের সঙ্গে তার ঘাতকও মরেছে।

কিন্তু মেয়েটি সত্যসত্যই মারা গেল না। হারানো মেষের খোঁজে এসে এক মেষপালক সেই মেয়েটিকে দেখতে পেল—আর দেখতে পেল পুঁটলিভরা একরাশি সোনার মোহর। সোনা ও মেয়ে—দুটি জিনিসই নিয়ে ঘরে ফিরে গেল সে! অ্যান্টিগোনাসের দেহটাকেও সেই মেষপালকই কবর দিয়ে গেল।

সেই রাশিরাশি মোহর দিয়ে মেষপালক অনেক জমি-জায়গা কিনে রীতিমত ধনী হয়ে উঠল। মেয়েটিকে সে নিজের মেয়ের মতই লালন-পালন করতে লাগল, নাম দিল পার্ডিটা।

* * *

এরপর কেটে গেল দীর্ঘ ষোল বৎসর।

ক্যামিলো এখন বোহেমিয়ার একজন মান্যগণ্য প্রধান ব্যক্তি। রাজা পলিক্সেনিস কোনদিন ভুলে যাননি যে ক্যামিলোর জন্যই সিসিলিয়াতে তাঁর প্রাণরক্ষা হয়েছিল। সেই মহা উপকারের যোগ্য পুরস্কার দেবার জন্য তিনি ক্যামিলোকে ধনে মানে পদগৌরবে এত বড় করে তুলেছেন যে বোহেমিয়াতে ক্যামিলোর সম্মান এখন প্রায় রাজারই সমান।

কিন্তু বয়স বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্যামিলো জন্মভূমিতে ফিরে যাওয়ার জন্য একান্ত ব্যাকুল হয়েছেন। লিয়ন্তিস যেদিন নিজের ভুল বুঝতে পেরেছেন, সেদিন থেকেই অনুতপ্ত চিত্তে বারংবার ক্যামিলোকে ডেকে পাঠাচ্ছেন দেশে ফিরে আসবার জন্য, কিন্তু পলিক্সেনিস কিছুতেই ছাড়েননি ক্যামিলোকে, এখনও ছাড়তে তিনি রাজী নন। তাই ক্যামিলো কোন কৌশলের আশ্রয় নিয়ে নিজের দেশে পালিয়ে যাবার কথা ভাবছেন।

এই সময়ে পলিক্সেনিসের একমাত্র পুত্র যুবরাজ ফ্লোরিজেল সাগরতীরে কোন গ্রামে বাজপাখি ওড়াতে গিয়ে এক মেষপালকের খামারবাড়িতে এক

অপরূপ রূপসী মেয়েকে দেখে এসে তাকেই বিয়ে করতে মনস্থ করেছেন। মেষপালকের মেয়ের নাম পার্ডিটা।

একথা শুনে রাজার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল! এ কী লজ্জার কথা! সিংহাসনের ভবিষ্যৎ অধিকারী তাঁর ছেলে কিনা একটা চাষার মেয়েকে বিয়ে করবে? দেশের ধনী মানী সমাজে তাহলে কি আর মুখ দেখানো যাবে? অন্যান্য দেশের রাজপরিবারেরা কি আর তাহলে বোহেমিয়ার রাজবংশকে নিজেদের সমান বলে স্বীকার করবে? ছিঃ ছিঃ! রূপ থাকলেই কি সব হল? রানী হয়ে যে-মেয়ে একদিন সিংহাসনে বসবে, তার তো যথোচিত শিক্ষাসহবৎ থাকা দরকার। ভেড়া চরানো যার কাজ, তার বুদ্ধিও হবে ভেড়ারই মত। রানীর মত চালচলন কথাবার্তা সে পাবে কোথায়? সিংহাসনে বসে সে তো রাজবংশের মান-মর্যাদা ধুলোয় মিশিয়ে দেবে!

এই বিপদে বন্ধু ক্যামিলোর সঙ্গে রাজা পরামর্শ করতে বসলেন। পরামর্শে স্থির হল যে, ছদ্মবেশে মেয়েটির বাড়িতে গিয়ে তাঁরা দুজনে মেয়েটিকে প্রথমে খুব গোপনে দেখে আসবেন।

শীতকালে মেষেদের গায়ের লোম খুব লম্বা হয়। তারপর বসন্ত ঋতু এলে মেষপালকেরা কেটে নেয় সেই লোম। সেসময়ে একটা বিশেষ দিনে এই লোম কাটা আরম্ভ করার রীতি আছে মেষপালকদের সমাজে। সেই বিশেষ দিনে বন্ধু ও বান্ধবীরা একসঙ্গে মিলে খাওয়া-দাওয়া করে, নাচ-গানও বাদ দেয় না। সেদিন ঐ মেষপালকের বাড়িতে এরকম একটা উৎসব হচ্ছিল।

এই উৎসবের রানী সেজেছে পার্ডিটা। তাকেই বিয়ে করবার জন্য পাগল যুবরাজ ফ্লোরিজেল। রাজা পলিক্সেনিস ও ক্যামিলো ছদ্মবেশে সেই উৎসবমণ্ডপে হাজির হয়ে পান-ভোজনে যোগদান করলেন। পার্ডিটার সঙ্গে তাঁরা আলাপও করলেন কিছুক্ষণ। কিন্তু যখন উৎসবের শেষে ফ্লোরিজেলের সঙ্গে পার্ডিটার বিয়ের বাগদান পাকাপাকি করে ফেলার উপক্রম হল, তখন রাজা আর চুপ করে থাকতে পারলেন না।

রাজা পলিক্সেনিস রেগে নিজের ছদ্মবেশ দূরে ছুড়ে ফেললেন এবং ফ্লোরিজেলকে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করতে লাগলেন। তারপর তিনি বললেন—এ বিয়ে তিনি কখনোই হতে দেবেন না। বুড়ো মেষ-পালককে এই বলে শাসিয়ে গেলেন যে এ-বিয়ের মতলব তার মেয়ের

মাথা থেকে ঘুচিয়ে দিতে না পারলে এক সপ্তাহ পরে তার নিজেরই প্রাণদণ্ড হবে।

এই বলে তর্জন-গর্জন করতে করতে রাজা সেই উৎসবমণ্ডপ ছেড়ে চলে গেলেন। ক্যামিলো কিন্তু তখনি ফিরে গেলেন না। তাঁর যে আরও একটা উদ্দেশ্য আছে।

তিনি কথা কইলেন ফ্লোরিজেলের সঙ্গে। বুড়ো মেষপালককে ধরে তার মাথা কেটে ফেলা সোজা, কিন্তু ফ্লোরিজেল কি তাতে বিয়ে বন্ধ করবেন? তিনি কি ভয় পেয়ে পার্ডিটাকে ছেড়ে পালিয়ে যাবেন?

ফ্লোরিজেলকে জিজ্ঞাসা করে ক্যামিলো জানলেন—পিতার রাগ দেখে তিনি মোটেই ভয় পাননি এবং ভবিষ্যতে সিংহাসন লাভের আশা বিসর্জন দিয়েও তিনি পার্ডিটাকে বিয়ে করতে ইচ্ছুক। তখন ক্যামিলো সিসিলিয়াতে গিয়ে রাজা লিয়ন্তিসের আশ্রয় নিতে ফ্লোরিজেলকে পরামর্শ দিলেন।

বিয়েটা তাড়াতাড়ি সেরে ফেলতে বললেন ক্যামিলো। পার্ডিটাকে দেখে তাঁর বিশ্বাস হয়েছে যে এমন অসাধারণ মেয়ে কখনো সত্যি-সত্যি মেষপালকের মেয়ে হতে পারে না। এর দেহে নিশ্চয়ই কোন রাজবংশের রক্ত আছে। একে বিয়ে করলে ফ্লোরিজেলকে কখনোই অনুতাপ করতে হবে না!

ক্যামিলোর পরামর্শ পছন্দ হল ফ্লোরিজেলের। তিনি পার্ডিটাকে নিয়ে সিসিলিয়াতে রওনা হলেন অতি গোপনে।

কিন্তু ক্যামিলোর চাতুরীর শেষ নেই। ফ্লোরিজেল রওনা হয়ে যাওয়ার পরেই তিনি রাজাকে গিয়ে বললেন, "মহারাজ! সর্বনাশ হয়েছে, যুবরাজ বলা ত যায় না! আর হয়ত যুবরাজ কোনদিনই ফিরে আসবেন না এবং আপনার সঙ্গে এ-জীবনে দেখা হবে না।"

রাজার মনেও সেই আশঙ্কারই উদয় হল। তিনি ক্যামিলো এবং অন্য কর্মচারীদের নিয়ে রওনা হলেন লিয়ন্তিসের দেশে।

এতদিনে ক্যামিলোর দেশে ফেরার আশা পূর্ণ হল।

তাঁদের পেছনে পেছনে গেল সেই মেষপালক। সে-বেচারীর মনে দারুণ ভয়—এক সপ্তাহ পরে তার প্রাণদণ্ড হবে। তাকে কেউ পরামর্শ দিয়েছে যে পার্ডিটা তার সত্যিকার মেয়ে নয়, পালিতা কন্যা মাত্র—এই কথাটি রাজাকে বোঝাতে পারলে সে নিশ্চয়ই প্রাণে বেঁচে যাবে।

পার্ডিটার দোষে তার পালকপিতার সাজা হওয়াটা যে অন্যায়, একথা রাজার নজরে আনা দরকার।

রাজাকে বোঝানো যে শক্ত হবে না, তা মেষপালক জানে। কারণ যে পুঁটলিতে অ্যান্টিগোনাস সোনার মোহর রেখে গিয়েছিলেন, সেই পুঁটলিটিই মস্ত বড় প্রমাণ। আরও প্রমাণ রয়েছে—শিশু পার্ডিটার গায়ে তখন যে সোনাজড়ানো পোশাক ছিল, সেই পোশাকটা এখনও আছে। অ্যান্টিগোনাসের কবরও রয়েছে, প্রয়োজন হলে সেটাও খুঁড়ে দেখানো যেতে পারে যে সত্যিই একটা বিদেশী লোক এই মেয়েকে এদেশে এনেছিল।

কিন্তু মনস্থির করে বেরুতে তার সময় লাগল। যখন সে রাজসভায় গেল, তখন রাজা সিসিলিয়ায় রওনা হয়েছেন। সেও তার প্রমাণ সমেত রওনা হল সেখানে।

ফ্লোরিজেলের পিছনে ছুটতে ছুটতে পলিক্সেনিস যখন বন্ধু লিয়ন্তিসের সভায় পৌঁছোলেন তখন লিয়ন্তিসের হৃদয় অনুতাপে পূর্ণ। তাঁর চোখে জলের ধারা। দুই বন্ধু অতীতের ভুল বোঝাবুঝি ক্ষমা করে পরিপূর্ণ আনন্দে আবার মিলিত হলেন।

এই সময়ে বুড়ো মেষপালক এসে হাজির করল একঝুড়ি প্রমাণ। সেসব দেখে দুই রাজার মনে আর কোন সন্দেহই রইল না যে অজানা বিদেশে যে ছোট মেয়েটিকে ফেলে দিয়ে এসেছিল অ্যান্টিগোনাস, সে মরেনি। আজকের এই মেষপালকের ঘরের অপরূপ রূপসী পার্ডিটাই সিসিলিয়ার সেই রাজকন্যা। সুতরাং পার্ডিটাকে বোহেমিয়ার রাজবংশের বউ বলে গ্রহণে কোন আপত্তিই আর উঠতে পারে না।

তখন চারদিকে বিয়ের উৎসবের বাজনা বেজে উঠল। তবু পরিপূর্ণ আনন্দের মাঝে একটা দুঃখ সবাইকে পীড়া দিতে লাগল—আজ হার্মিয়োন জীবিত নেই। তাঁর উপর যে অবিচার আর অত্যাচার হয়েছিল, তার জন্য লিয়ন্তিসকে ক্ষমা চাইবারও সুযোগ না দিয়ে তিনি চলে গেলেন। লিয়ন্তিসের চোখের জল আর থামে না।

তখন পলিনা বললেন, "মহারাজ! রানী অবশ্য জীবিত নেই, কিন্তু এক প্রসিদ্ধ শিল্পীকে দিয়ে আমি রানীর একটি মূর্তি তৈরি করিয়েছি। সে-মূর্তি যে দেখেছে সে-ই বলেছে যেন জীবন্ত রানীই সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। আপনারা যদি ইচ্ছা করেন, দয়া করে আমার বাড়িতে এসে সেই মূর্তিটা দেখতে পারেন। তাতে মহারাজেরও শোক কতকটা শান্ত

হতে পারে, আর পার্ডিটা এই মূর্তিটি দেখলে অন্ততঃ বুঝতে পারবে যে তার মাও তার চেয়ে কম সুন্দরী ছিলেন না।"

একথা শুনে সবাই তখনই পলিনার বাড়িতে গেলেন। একটি পরদার আড়ালে দাঁড় করানো ছিল হার্মিয়োনের মূর্তি। পরদা টেনে নিতেই সবাই বিস্ময়ে নির্বাক্ হয়ে গেলেন। এ কি মূর্তি, না জীবন্ত মানুষ?

লিয়ন্তিসের মনে হল—না, এ মূর্তি নয়, জীবন্ত হার্মিয়োনই। তিনি আত্মহারা হয়ে ছুটে গেলেন মূর্তির দিকে। বিস্ময়ের উপর বিস্ময়! সেই মূর্তিও বেদী থেকে নেমে এসে লিয়ন্তিসের কণ্ঠ বাহু দিয়ে বেষ্টন করল।

হার্মিয়োন মরেননি। এই দীর্ঘদিন তিনি এই আশায় পলিনার বাড়িতে গোপনে বাস করছিলেন যে দুঃখের দিন চিরদিন থাকবে না, সত্যের জয় একদিন না একদিন হবেই হবে।



টেম্পেস্ট

অকূল সাগরের মধ্যে জনহীন এক দ্বীপ। সেখানে বাস করে মাত্র দুজন প্রাণী—প্রস্পেরো আর মিরাণ্ডা—বাপ আর মেয়ে। প্রস্পেরোর বয়স হয়েছে, কিন্তু দেহ দুর্বল হলেও মনে তাঁর যথেষ্ট জোর। আর তাঁর মেয়ে মিরাণ্ডা তরুণী, অপরূপ সুন্দরী—যেন সদ্য ফোটা গোলাপ ফুল। মিরাণ্ডা যখন খুবই শিশু, প্রস্পেরো তাকে সঙ্গে করে এই দ্বীপে চলে আসেন। শৈশবের কোন কথাই মিরাণ্ডার মনে ছিল না! সেই ছোট্ট দ্বীপটুকুর বাইরে আর যে কিছু আছে, তা সে জানে না। তার বাবাকে ছাড়া সে আর কোন মানুষকে দেখেনি কখনো।

দ্বীপে আছে অনেক পাহাড়। সেই পাহাড়ের এক গুহায় তারা বাস করে।

মস্ত বড় গুহা—পাথর দিয়ে তাকে গোটাকতক ছোট ছোট ঘরে ভাগ করা হয়েছে। একটা ঘরে আছে রাশি রাশি বই—বৃদ্ধ—প্রস্পেরোর সঙ্গী জাদুবিদ্যার বই। যে সময়ের কথা বলছি, তখন জাদুবিদ্যার আদর ছিল খুবই। প্রস্পেরো ছিলেন জাদুবিদ্যায় ওস্তাদ।

সেই দ্বীপে বাস করে আর এক অদ্ভুত আকারের জীব, নাম তার ক্যালিবান। তার মা সিকোরাক্স নামে এক ডাইনী বাস করত এই দ্বীপে। প্রস্পেরো এখানে আসার কিছুদিন আগে সে মারা গেছে। এই ডাইনীটা ছিল ভারী পাজী। সেই দ্বীপে অনেক অশরীরী ভূতও বাস করত। কিন্তু তারা কারও ক্ষতি করত না। এই সব নিরীহ ভালমানুষ ভূতদের ডাইনী সিকোরাক্স গাছের কোটরে বন্দী করে রাখত। যন্ত্রণায় তারা আর্তনাদ করত, আর ডাইনী সিকোরাক্স সেই আর্তনাদ শুনে আনন্দে নাচত।

প্রস্পেরো দ্বীপে এসে দেখেন ভূতেরা সব বন্দী। জাদুবিদ্যার সাহায্যে তিনি তাদের মুক্তি দেন। তাই তারা সবাই প্রস্পেরোর ভীষণ বাধ্য হয়ে পড়ে। এরিয়েল ছিল সেই খালাস-পাওয়া ভূতদের সর্দার।

দুরন্ত শিশুর মত এরিয়েল সদাই চটপটে আর সদাই হাসিখুশি। কারো ক্ষতি করার ইচ্ছা তার নেই। একমাত্র সিকোরাক্সের ওপর তার ছিল রাগ। কিন্তু সিকোরাক্স ত এখন আর বেঁচে নেই, আছে তার ছেলে ক্যালিবান। এরিয়েল তাই সুবিধে পেলেই ক্যালিবানকে খুঁচিয়ে মনের জ্বালা মেটায়।

ক্যালিবানকে দেখতে অতি কদাকার। বানরের মত তাঁর মুখের চেহারা আর সেই রকমই তার স্বভাব। গোড়ায় প্রস্পেরো ক্যালিবানকে তাঁর গুহায় নিয়ে এসে তার সঙ্গে খুব সদয় ব্যবহার করতেন। কিন্তু সে পেয়েছে তার মায়ের কু-স্বভাব আর নীচতা। প্রস্পেরো ক্যালিবানকে ভাল করবার খুবই চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তাকে ভালো কাজ শেখাবার সব চেষ্টাই তাঁর বিফল হয়েছে। তাই এখন জঙ্গল হতে কাঠ আনা আর ঐ রকম সব ভারী কাজের ভার প্রস্পেরো তার উপর দিয়েছেন।

ক্যালিবান যাতে কাজে ফাঁকি না দেয়, তার জন্য এরিয়েলকে তার ওপর নজর রাখতে বলেছেন। ক্যালিবান সুবিধা পেলেই কাজে গাফিলতি করে। এরিয়েল তখুনি অদৃশ্য হয়ে দেয় তাকে চিমটি! যন্ত্রণায় 'উহুঃ' করতে করতে ক্যালিবান আবার কাজ সুরু করে। কখনও কখনও এরিয়েল ক্যালিবানকে ঠেলে কাদায় ফেলে দেয়। ক্যালিবান কাদায় গড়াগড়ি যায়। এরিয়েল বাঁদর সেজে তাকে মুখ ভেংচায় আবার কিছু পরে শজারুর মূর্তি ধরে ক্যালিবানের দিকে ছুটে আসে! শজারুর কাঁটা গায়ে ফুটবে—এই ভয়ে ক্যালিবান শিউরে উঠে। এইভাবে

ক্যালিবানকে উত্ত্যক্ত করবার নিত্য নতুন ফন্দি বার করাই হল এরিয়েলের কাজ।

এই সব শক্তিশালী ভূতদের নিজের বশে পেয়ে প্রস্পেরোর শক্তি খুবই বেড়ে গেছে। বাতাস আর সাগরের ওপর এদের সাহায্যে তিনি প্রভুত্ব করেন। ইচ্ছে করলে তিনি ঝড় তুলে শান্ত সাগরকে পারেন অশান্ত করে তুলতে, আবার ঝড় থামিয়ে অশান্ত সাগরকে করতে পারেন শান্ত।

একদিন প্রস্পেরো তাঁর অনুচর ভূতদের আদেশ করলেন, "সাগরে ঝড় তোলো।" দেখতে দেখতে প্রচণ্ড বেগে ঝড় বইতে লাগল। পাহাড়প্রমাণ ঢেউ উঠতে লাগল সাগরের জলে। উত্তাল তরঙ্গের মাঝে দেখা গেল একটা জাহাজ, ঢেউ আর ঝড়ের সঙ্গে অসহায়ভাবে যুদ্ধ করছে। প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছে এই বুঝি জাহাজটা ডুবে গেল!

প্রস্পেরো মিরাণ্ডাকে ডাকেন। মিরাণ্ডা এলে তাকে জাহাজটি দেখান। মিরাণ্ডাকে বলেন, "ঐ যে জাহাজ দেখছ, ওতে তোমার আমার মত বহু লোক আছে।"

মিরাণ্ডা নারী। মন তার স্বভাবতঃই কোমল। সংসারের পাপের স্পর্শ সে পায়নি। তাই আপনা থেকেই পরের বিপদে তার মন কেঁদে ওঠে। আকুল হয়ে সে বাবাকে বলে, "বাবা, ওদের বাঁচাও! পাহাড়ে ধাক্কা লেগে এখুনি জাহাজ ডুবে যাবে। আর যারা এই জাহাজে রয়েছে, তারা যাবে অতলে তলিয়ে। আমার যদি তোমার মত শক্তি থাকত, আমি এখনি ওদের বাঁচাতুম।"

"উতলা হয়ো না, মা মিরাণ্ডা! ওদের কোন ক্ষতি হবে না"—প্রস্পেরো সান্ত্বনা দেন তাকে,—"আমি ভূতদের আদেশ দিয়েছি, তারা দেখবে জাহাজের কোন লোক যেন আঘাত না পায়। এসব আমি করছি কেবল তোমার ভালর জন্য।"

মিরাণ্ডা অবাক্ হয়ে তাকায় তার বাবার দিকে। ঐ জাহাজটাকে বিপদে ফেললে তার ভাল হবে, এ কথার মানে কী, সে বুঝতে পারে না।

তাকে বুঝিয়ে দেবার জন্য প্রস্পেরো ধীরে ধীরে তাঁর পুরোনো জীবনের কাহিনী বলতে থাকেন। শুরু করেন এই বলে—"তোমায় সব বলছি শোনো। তুমি কে, তা তোমার মনে নেই। কোথা থেকে এখানে এসেছ, তাও তোমার জানা নেই। এই আমি, আমি তোমার বাবা, এইটুকুই শুধু

আমার সম্বন্ধে জানা আছে তোমার। কিন্তু আমি কে, সে কথাও তুমি জান না। এই দ্বীপে বাস করবার আগে কোথায় ছিল তোমার বাড়ি—সেকথা কি তোমার মনে আছে? থাকবেই বা কি করে? বয়স তোমার তখন তিনও হয়নি।"

"না বাবা! আমার বেশী কিছু মনে পড়ে না, শুধু স্বপ্নের মত মনে হয় যেন কোন এক সময় পাঁচ-ছ' জন ঝি আমায় দেখাশুনা করত! ঠিক না, বাবা?"—মিরাণ্ডা বলে।

প্রস্পেরো অবাক হয়ে বলেন, "ঠিকই বলেছ, মা! পাঁচ-ছ'জন নয়, আরও অনেক ঝি তোমার ছিল। আচ্ছা মা! তোমার কি মনে পড়ে, কি করে এখানে এলে?"

মিরাণ্ডা জবাব দেয়, "না, বাবা!"

এবার প্রস্পেরো তাঁর পুরোনো জীবনের কাহিনী মিরাণ্ডাকে বলতে থাকেন:

"বার বছর আগের কথা। আমি ছিলাম মিলান দেশের ডিউক। তুমি আমার একমাত্র মেয়ে। আমার মৃত্যুর পরে তুমি হতে সেই রাজ্যের মালিক। কিন্তু আমার ছোট ভাই অ্যানটোনিওর সেটা সইল না। আমি পড়াশুনা ভালবাসি। তাই শুধু পড়াশুনায় ব্যস্ত থাকতাম। রাজ্যের কাজকর্ম কিছুই দেখতাম না। রাজ্যের শাসন-কাজ ছোট ভাইয়ের হাতেই পুরোপুরি ছেড়ে দিয়েছিলাম। খুবই বিশ্বাস করতাম তাকে।

কিন্তু সেই ভাই আমার অগাধ বিশ্বাসের মর্যাদা রাখেনি। রাজ্যশাসনের ভার পেয়ে তার মাথায় দুষ্ট বুদ্ধি চাপল। আমাকে সরিয়ে রাজ্যের মালিক হবে—এই পাপ চিন্তা তার মনে জেগে ওঠে। সে কৌশলে প্রজাদের হাত করল, তারপর আমার শত্রু নেপল্‌সের রাজার সঙ্গে ষড়যন্ত্র করল। নেপল্‌সের রাজা অ্যালোনসো ছিলেন বেশ শক্তিশালী। তারা দুজনে মিলে একদিন আমাকে তাড়িয়ে দিল আমারই রাজ্য থেকে।"

"ইচ্ছে করলে তখনি ত ওরা আমাদের মেরে ফেলতে পারত! কিন্তু মারলে না কেন, বাবা?"—জিজ্ঞাসা করল মিরাণ্ডা।

"তারা তা করতে সাহস করেনি। প্রজাদের মনে তখনও আমার জন্য কিছুটা ভালবাসা ছিল। প্রকাশ্যে আমায় মেরে ফেললে পাছে প্রজারা ক্ষেপে ওঠে এই ভয়ে তারা আমাদের এক জাহাজে নিয়ে গিয়ে তোলে। তীর ছেড়ে সেই জাহাজ বহু দূরে চলে আসে। চারদিকে নীল সাগরের

জল। তীর আর চোখ পড়ে না। তখন অ্যানটোনিও আমাদের জাহাজ থেকে নামিয়ে একটি ছোট নৌকায় তুলে ভাসিয়ে দিল। পাল বা মাস্তুল বা দাঁড় কিছুই সে নৌকায় ছিল না। তাই চেয়েছিল আমাদের মৃত্যু। সে জানত, সেই অকূল সাগরে বাঁচবার আমাদের কোন উপায় নেই। তাই এক কণা খাবার বা এক ফালি কাপড় কিছুই সে আমাদের নৌকায় তুলে দেয়নি। কিন্তু সেই জাহাজে ছিল গঞ্জালো নামে এক দয়ালু রাজসভাসদ্। সে কয়েকটা বই, জামা-কাপড়, আর কয়েকদিনের মত খাবার লুকিয়ে আমাদের নৌকায় চাপিয়ে দেয়। সে জানত যে ওই বইগুলি আমি বড়ই ভালবাসি!"

"আমাকে নিয়ে তোমার তখন কতই না কষ্ট হয়েছিল, বাবা!"—মিরাণ্ডার গলার স্বর বেদনায় কেঁপে ওঠে।

"না মা! না"—প্রস্পেরো বললেন,—"তুমি তখন ছিলে বলেই আমি আজও বেঁচে আছি। তোমার সুন্দর কচি মুখের সরল হাসিটিই তখন আমার মনে আনন্দ দিয়েছে, দিয়েছে শক্তি।

হ্যাঁ, যা বলছিলাম, শোন। নৌকায় যে খাবার গঞ্জালো দিয়েছিল, তাতে এই নির্জন দ্বীপে আসা অবধি বেশ চলে গেল। এখানে পৌঁছে আমার প্রথম কাজ হল, তোমায় ভাল করে লেখাপড়া শেখানো। মনে হয়, আমি তাতে সফল হয়েছি।"

মিরাণ্ডা বলে, "বাবা! আমার জীবন, আমার লেখাপড়া সবই ত তোমার দান। এ-ঋণ কোনদিন শোধ করতে আমি পারব না। কিন্তু আমায় ত বললে না, সাগরে এই ভীষণ ঝড় আজ তুললে কেন?"

প্রস্পেরো বলেন, "ঐ জাহাজেই আছে আমার পরম শত্রু নেপল্‌সের সেই রাজা, আর আছে আমার নিজের সেই বেইমান ছোট ভাই। ঝড়ের মুখে পড়ে তারা এই দ্বীপের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে।"

প্রস্পেরোর হাতে ছিল একখানা ছোট লাঠি। সেটা ছিল তাঁর জাদু-দণ্ড, মন্তর পড়ে যার ভিতর তিনি জাদুর শক্তি ঢুকিয়ে দিয়েছেন। কথা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে প্রস্পেরো সেই জাদুদণ্ড মিরাণ্ডার গায়ে ছোঁয়ালেন। দেখতে দেখতে ঘুমের ঘোরে মিরাণ্ডার চোখ বুজে এলো। সে অঘোরে ঘুমিয়ে পড়লো।

সেই সময় এরিয়েল কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। ঝড়ে জাহাজের ও যাত্রীদের কি হল তা জানাবার জন্যেই তাকে প্রস্পেরো ডেকেছেন। সে এসেছে, কিন্তু

প্রস্পেরো ছাড়া অন্য সকলের চোখে সে অদৃশ্য। মিরাণ্ডা আজও অবধি তাকে কখনও দেখতে পায়নি। প্রস্পেরো চান না, এরিয়েলের সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা মিরাণ্ডা শোনে। শুনলে সে ভাববে—'একি অদ্ভুত! তার বাবা শূন্যের সাথে কথা বলছেন!' তাই মিরাণ্ডাকে প্রথমেই জাদুর জোরে ঘুম পাড়িয়ে রেখে তিনি এরিয়েলকে জিজ্ঞাসা করলেন, "এরিয়েল! সত্যিই তোমার সাহস আছে। যাহোক্, এখন বলত, কাজ কতদূর এগিয়েছে?"

এরিয়েল প্রথমে ঝড়ের বর্ণনা দিল: সে ত শুধু ঝড় নয়, সে যেন হাজার হাজার ক্রুদ্ধ দানবের মরণপণ যুদ্ধের মাতামাতি। আকাশে কাল অন্ধকার, সাগরে আথালপাথাল ঢেউ, বাতাসে ক্ষ্যাপা চিৎকার। প্রলয়ের দিন যেন ঘনিয়ে এসেছে জাহাজ ঘিরে!

আর হতভাগ্য নাবিকগুলো মৃত্যু সামনে দেখে যেন ভয়ে পাথর বনে গিয়েছে! দড়িদড়া ধরে টানাটানি করবারও শক্তি নেই তাদের দেহে। কাপ্তেনের হুকুম যেন তাদের কানেই ঢুকছে না! কেউ পাটাতনে বসে পড়ে আকুল হয়ে দেবতাকে ডাকছে, কেউ বা নির্বাক্ হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে থরথর করে কাঁপছেই শুধু!

নেপল্‌সের রাজার ছেলে ফার্ডিন্যাণ্ড—সেও রয়েছে জাহাজে। জাহাজ ডুববেই দেখে সে ভাবল—খাঁচায় বদ্ধ ইঁদুরের মত অসহায় ভাবে মরা বীরের কাজ নয়। সে ঝাঁপ দিল সেই আকাশ-ছোঁয়া ঢেউয়ের বুকে। মরতে যদি হয়, ঢেউয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে সে মরবে। ঝাঁপ দিয়ে পড়ামাত্র পাহাড়-সমান একটা ঢেউ এসে ফার্ডিন্যাণ্ডকে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে গেল। তার বাবা, নেপল্‌সের রাজা, চোখের সামনে ছেলেকে ডুবে যেতে দেখে হাহাকার করে কেঁদে উঠলেন।

ফার্ডিন্যাণ্ড কিন্তু সত্যিই ডোবেনি। এরিয়েলের সাহায্যে সে তীরে এসে ওঠে। তার কোন আঘাত লাগেনি। দ্বীপের এক কোণে মাথায় হাত দিয়ে উদাস হয়ে সে বসে আছে। সে ধরে নিয়েছে, বাবা তার বেঁচে নেই, সাগরে ডুবে গেছেন! বাবার শোকে তার চোখ দিয়ে দরদর করে জল পড়ছে।

এরিয়েলের সব কথা শুনে প্রস্পেরো খুশী হলেন। তিনি যেমনটি চেয়েছিলেন, ঠিক সেভাবেই কাজ সমাধা করেছে এরিয়েল। প্রস্পেরো এবার বললেন, "রাজপুত্র ফার্ডিন্যাণ্ডকে এখানে নিয়ে এস। মিরাণ্ডা

তাকে দেখবে। হ্যাঁ, নেপল্‌সের রাজা আর আমার ছোট ভাই আছে কোথায় ?"

এরিয়েল জবাব দেয়, "তাঁরা দ্বীপে উঠেছেন। তাঁদের ধারণা, ফার্ডিন্যাণ্ড বেঁচে নেই, আর যদি বেঁচে থাকে এই আশায় তাঁরা তাকে এখন খোঁজাখুঁজি করছেন। জাহাজের নাবিকরাও সবাই বেঁচে আছে। কিন্তু প্রত্যেকেই ভাবছে, সে ছাড়া বাকী সকলেই মারা গেছে। জাহাজটিও অক্ষত অবস্থায় তীরে আছে।"

"বেশ, বেশ ! তোমার কর্তব্য ঠিক ঠিক পালন করেছ, কিন্তু আরও অনেক কাজ বাকী আছে।"—এই বলে প্রস্পেরো আর কি কি কাজ করতে হবে তা এরিয়েলকে বুঝিয়ে দেন। প্রস্পেরোর আদেশ মত এরিয়েল উড়ে গিয়ে তখুনি যেখানে মাটিতে বসে ফার্ডিন্যাণ্ড একা একা আপন মনে হা-হুতাশ করছে, সেখানে হাজির হল।

অদৃশ্য থেকেই সে বলে, "মশাই ! আমার সঙ্গে আপনাকে এখনি আসতে হবে। আপনাকে আমার প্রভুর মেয়ে মিরাণ্ডা দেখবে। মশাই ! উঠে আসুন।" এই বলে সে গান শুরু করে। গানের ভিতর দিয়ে সে ফার্ডিন্যাণ্ডকে বোঝাতে চায় যে তার পিতা জলে ডুবে মারা গেছেন, তাঁর সঙ্গে জীবনে আর তার দেখা হবে না।

ফার্ডিন্যাণ্ড অসাড় হয়ে সাগরতীরে পড়ে ছিল। হঠাৎ বাতাসে গানের শব্দ শুনে সে চমকে উঠে বসে। পিতা বেঁচে নেই, এটা সে আগেই অনুমান করেছে। কিন্তু কে এসে সেকথা তাকে গান গেয়ে গেয়ে শোনাচ্ছে ? চোখে তো কাউকে সে দেখতে পাচ্ছে না। কে এই অশরীরী গায়ক ? এক অদম্য কৌতূহলের বশে ফার্ডিন্যাণ্ড গানের স্বর লক্ষ্য করে দ্বীপের ভিতরে এগিয়ে চলে।

প্রস্পেরো ও মিরাণ্ডা গাছের ছায়ায় বসে আছেন। এমন সময় দেখা গেল দূরে একটি লোক তাঁদের দিকে এগিয়ে আসছে। গানের সুর অনুসরণ করে ফার্ডিন্যাণ্ড ক্রমশঃ প্রস্পেরোর কাছেই এসে পড়েছে।

ফার্ডিন্যাণ্ডকে প্রস্পেরো দেখতে পান। সেদিকে মিরাণ্ডার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, "মা, দূরে কে আসছে দেখ তো ?"

মিরাণ্ডা আগে তার বাবা ছাড়া আর কোন মানুষকে দেখেনি। ফার্ডিন্যাণ্ডকে দেখে সে বলে ওঠে, "বাবা, এ নিশ্চয়ই কোন ভূত ! কি-রকম

করে চার পাশে দেখছে দেখ! কিন্তু ভূত কি এত সুন্দর হয়? একি ভূত, না আর কিছু?"

প্রস্পেরো বলেন, "না, মা! এ ভূত নয়। সেই জাহাজে এ লোকটা ছিল। বোধ হয় তার সঙ্গীদের খুঁজছে।"

বাবার গম্ভীর মুখ আর পাকা দাড়ি দেখাই মিরাণ্ডার অভ্যাস। তাই পুরুষের মুখ ভাবতে গেলেই বাবার মুখের মত গম্ভীর, গোঁফ-দাড়িতে ভরা মুখের চেহারা তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। এ তবে কি-রকম পুরুষ? যুবক ফার্ডিন্যাণ্ডের অপরূপ সুন্দর মূর্তি দেখে মিরাণ্ডা অবাক্ আর মুগ্ধ হয়ে তার দিকে তাকায়।

ফার্ডিন্যাণ্ডও এই নির্জন দ্বীপে সুন্দরী মিরাণ্ডাকে দেখে তেমনি বিহ্বল। তার মনে হয় ইনি নিশ্চয়ই কোন দেবী। এই অজানা আশ্চর্য দ্বীপ নিশ্চয় এঁরই শাসনে রয়েছে! তাই এমন ভাষায় ফার্ডিন্যাণ্ড মিরাণ্ডার বন্দনা করে, যেন দেবীই তার সামনে রয়েছেন।

খুব সংকোচে মধুর স্বরে মিরাণ্ডা বলে, "আমি তোমারই মত সাধারণ মানুষ। আমার—"

মিরাণ্ডা তার পরিচয় দেবার আগেই প্রস্পেরো তাকে বাধা দেন। তিনি বুঝেছিলেন, রাজপুত্র আর মিরাণ্ডা পরস্পরকে দেখে মুগ্ধ হয়েছে। তারা দুজনে দুজনকে ভালবেসে ফেলেছে। কিন্তু গোড়াতেই ত এদের ইচ্ছামত চলতে দেওয়া যায় না। আগে ফার্ডিন্যাণ্ডের ভালবাসা কত গভীর, তা পরীক্ষা করে দেখবেন তিনি। তাই ফার্ডিন্যাণ্ডকে ধমক দিয়ে বলেন, "আমিই এই দ্বীপের মালিক। আমি জানি, তুমি কি উদ্দেশ্যে এখানে এসেছ, তুমি আমার কাছ থেকে এই দ্বীপ ছিনিয়ে নিতে এসেছ। তোমাকে এর শাস্তি পেতে হবে। তোমার গলায় আর হাতে-পায়ে দড়ি বেঁধে ফেলে রাখব! তোমার খাদ্য হবে শুকনো গাছের মূল, আর তেষ্টা পেলে পাবে সাগরের নোনা জল!"

"তাই নাকি!" ফার্ডিন্যাণ্ড ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলে, "আপনার দেওয়া শাস্তি আমি নেব কেন?" এই বলে সে খাপ থেকে তলোয়ার খোলে। অমনি প্রস্পেরোও তাঁর জাদুদণ্ড তুলে ধরে মন্ত্র পড়েন। ফার্ডিন্যাণ্ড আর নড়তে পারে না, যেখানে ছিল সেখানেই পাথরের মত দাঁড়িয়ে থাকে।

মিরাণ্ডা ফার্ডিন্যাণ্ডের জন্য ওকালতি করে। সে বলে, "বাবা, তুমি তো এত নিষ্ঠুর নও! কেন এই সুন্দর লোকটিকে শাস্তি দিচ্ছ? ক্ষমা কর

ওকে। আমি ওর জামিন হব। ও কোন অন্যায় করবে না। এই প্রথম তুমি ছাড়া দ্বিতীয় আর একজন মানুষ দেখলাম। ভগবানের এমন সুন্দর সৃষ্টি যে মানুষ, সে কি কখনো অপরাধ করতে পারে বাবা ?"

"তুমি থাম ! না হলে বকুনি খাবে," মিরাণ্ডাকে ধমক দেন প্রস্পেরো, "এই ডাকাতের হয়ে ওকালতি করতে লজ্জা করে না ? তুমি জগতের কি জান ? তুমি দেখেছ শুধু একে আর ক্যালিবানকে। তাতেই তুমি বুঝতে পেরে গেলে যে কোন্ লোক কী করতে পারে, আর কোন্ লোক কী করতে পারে না ? আমি বলছি তোমায়, জগতের বেশির ভাগ লোকই এর চেয়ে অনেক ভাল, অনেক সুন্দর।"

ফার্ডিন্যাণ্ডকে পরীক্ষা করার সঙ্গে সঙ্গে নিজের মেয়েকেও পরীক্ষা করে দেখা তাঁর উদ্দেশ্য, তাই মেয়ের সামনে ফার্ডিন্যাণ্ডের নিন্দা করেন। তিনি দেখতে চান যে ফার্ডিন্যাণ্ডের চেয়েও অনেক ভাল, অনেক সুন্দর লোক পৃথিবীতে আছে শুনে মিরাণ্ডা তাদের দেখবার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে কিনা।

সরলপ্রাণা মিরাণ্ডা বলে, "বাবা, আমার গণ্ডীর মত আমার ধারণাও খুব ছোট। এর চেয়ে ভাল লোক আমার চাই না।"

প্রস্পেরো মিরাণ্ডার কথায় কোন সাড়া দেন না। ফার্ডিন্যাণ্ডকে আদেশ করেন, "ফার্ডিন্যাণ্ড ! আমার সঙ্গে এস। দেখছ ত আর অবাধ্য হবার শক্তি তোমার নেই !"

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফার্ডিন্যাণ্ড বলে, "সত্যই তাই !" ইচ্ছা না থাকলেও তাকে প্রস্পেরোর অনুসরণ করতে হয়। যাবার সময় যতক্ষণ দেখা যায়, ঘাড় ফিরিয়ে সে মিরাণ্ডাকে দেখে। আপনার মনে সে বলে, "জানি না বুড়ো কি করে আমার সব শক্তি এভাবে কেড়ে নিল ! কিন্তু ঐ সুন্দরী মেয়েটিকে রোজ একবার করে যদি দেখতে পাই, তাহলে বুড়োর দেওয়া সব শাস্তি আমি হাসিমুখেই সইতে পারি !"

প্রথমে কয়েকদিন প্রস্পেরো ফার্ডিন্যাণ্ডকে গুহায় বন্দী করে রাখলেন। তার পরে তাকে দিনের বেলা এক একবার করে বাইরে বেরুতে দিতেন বটে, কিন্তু তার ঘাড়ে চাপিয়ে দিতেন কঠিন সব কাজের ভার। আর নিজের পড়ার ঘরে ঢুকে তিনি গোপনে শুনতেন ফার্ডিন্যাণ্ড আর মিরাণ্ডার আলাপ !

খুব ভারী সব কাঠের গুঁড়ি থাকের পর থাক সাজিয়ে রাখবার ভার

দিয়েছেন প্রস্পেরো ফার্ডিন্যাণ্ডকে। রাজার ছেলে সে। এমন কঠোর পরিশ্রম তার সইবে কেন? একটুতে সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তাই দেখে মিরাণ্ডা ব্যথিত হয়ে ওঠে। সে লুকিয়ে ফার্ডিন্যাণ্ডের কাছে এসে নানা কথায় তাকে আশ্বাস দেয়। বাবা জানতে না পারেন, এভাবে তার জন্য ফল নিয়ে আসে, নিয়ে আসে তৃষ্ণার জল। ফার্ডিন্যাণ্ডও ভুলে যায় সব দুঃখ। কোমলকণ্ঠে মিরাণ্ডা বলে, "বাবা এখন তাঁর পড়ার ঘরে। তুমি একটু বিশ্রাম কর!"

"আমি তো তা পারি না," দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ফার্ডিন্যাণ্ড উত্তর দেয়,—"অনেক কাজ বাকী পড়ে আছে।"

করুণাময়ী মিরাণ্ডা বলে, "তাহলে তুমি বস, আমি তোমার হয়ে কাজ করে দেই!"

ফার্ডিন্যাণ্ড তাতে রাজী হয় না। এভাবে দুজনের কথায় কথায় সময় কেটে যায়! কাজে ঢিলে পড়ে।

ওদিকে পড়ার ঘর থেকে চলে এসেছেন প্রস্পেরো। জাদুবিদ্যার বলে তিনি অদৃশ্য হয়ে ওদের কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন ওদের কথাবার্তা শোনবার জন্য। ওরা তা জানবে কেমন করে?

কাজের এক ফাঁকে ফার্ডিন্যাণ্ড মিরাণ্ডার নাম জিজ্ঞাসা করে।

মিরাণ্ডা তার নাম জানায়। সঙ্গে সঙ্গে বলে, "বাবা কিন্তু তোমায় আমার নাম জানাতে বারণ করেছেন!"

মিরাণ্ডার অবাধ্যতায় প্রস্পেরো কিন্তু রাগেন না। ভালবাসার টানে মিরাণ্ডা তাঁর বারণ ভুলে নিজের নাম বলায় তিনি মনে মনে হাসেন। ফার্ডিন্যাণ্ডের কথা শুনে তিনি কম খুশী হননি। তাদের কথাবার্তায় তিনি স্পষ্ট বুঝতে পারেন, তারা গভীরভাবেই পরস্পরকে ভালবেসে ফেলেছে। এইরকমটিই তিনি চেয়েছিলেন। এইটি ঘটাবার জন্যই ঝড়ের মুখে ফেলে জাহাজখানাকে তাঁর দ্বীপে টেনে এনেছেন।

দুজনে বসে কত কী আলোচনা করে। মিরাণ্ডা বলে, "বাবা ছাড়া প্রথম মানুষ এই তোমায় দেখলাম। তোমায় দেখবার পর আর কোন মানুষ আমি দেখতেও চাই না।"

ফার্ডিন্যাণ্ডও বলে, মিরাণ্ডার মত মেয়ে সে দেখেনি। মিরাণ্ডা রাজী হলে সে তাকে বিয়েও করতে রাজী। সে নিজের পরিচয় দেয়। বলে, "আমায় বিয়ে করলে ভবিষ্যতে তুমি হবে নেপল্সের রানী।"

আনন্দে মিরাণ্ডার চোখে জল এসে যায়। রানী হবার লোভে নয়, ফার্ডিন্যাণ্ডকে চিরদিনের জন্য একান্তভাবে আপন করে পাবার লোভে। সে বলে, "তুমি যদি বিয়ে কর, আমি তোমার স্ত্রী হতে রাজী।"

এমন সময় জাদুর আবরণ দূরে ফেলে দিয়ে প্রস্পেরো তাদের দেখা দিলেন। খুশী হয়ে আশ্বাস দিলেন, "তোমাদের সব কথা আমি শুনেছি। তোমরা যা ঠিক করেছ তাতে আমি রাজী।"

তারপর ফার্ডিন্যাণ্ডকে বললেন, "তোমাকে কষ্ট দিয়েছি, আর খুব কঠোর কথা বলেছি। সে কেবল তোমায় পরীক্ষা করবার উদ্দেশ্যে। পরীক্ষায় তুমি সফল হয়েছ, এখন তোমাকে পুরস্কার দেব। আমার এই মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ে দেব। আজ থেকে মিরাণ্ডা তোমার। মিরাণ্ডার মত মেয়ে খুঁজে পাবে না। আমার নিজের মেয়ে বলে একথা তোমায় বলছি না। ভবিষ্যতে তুমি নিজেই তার পরিচয় পাবে। তোমরা এখানে বসে গল্প কর। আমার অন্য কাজ আছে। কাজ সেরেই ফিরে আসব।"

এদিকে এরিয়েল ব্যস্ত রয়েছে জাহাজের অন্যসব আরোহীদের নিয়ে। আজ কয়েকদিন ধরেই সে ওদের চোখে চোখে রেখেছে। বিশেষ করে প্রস্পেরোর বেইমান ভাই অ্যানটোনিওকে, আর তার মুরুব্বী সেই নেপল্‌সের পররাজ্যলোভী রাজাটাকে। ওরা যখন ডুবন্ত জাহাজ থেকে কোনরকমে উদ্ধার পেয়ে এই জনহীন দ্বীপে এসে উঠল, তখন ভয়ে তারা দিশেহারা হয়ে পাগলের মত এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করতে থাকে। এভাবে দিনটা প্রায় কেটে গেল, ক্ষিধেয় তারা অবসন্ন, শরীর আর তাদের বইছে না। তখন এরিয়েল নানারকম উপাদেয় খাবার জিনিস এনে সাজিয়ে রাখল তাদের কাছাকাছি একটা জায়গায়। ঘুরতে ঘুরতে যেই তারা সেখানে এসেছে, খাবারগুলি দেখে তাদের আনন্দের আর সীমা রইল না। কার জন্য খাবার, কেই বা এখানে রেখেছে, কিছুমাত্র খোঁজ না নিয়ে তারা চটপট বসে পড়ল সেই খাবার গোগ্রাসে গিলবার জন্য। কিন্তু খাওয়ার মত বরাতই যদি তাদের থাকবে, তাহলে জাহাজডুবি হয়ে এ বিজন দ্বীপে এসে তাদের উঠতে হবে কেন? সবে খাবারগুলিতে তারা হাত দিয়েছে, অমনি এরিয়েল এসে উপস্থিত হল বিকট এক দৈত্যের বেশ ধরে। সে এসে হুংকার দিয়ে পড়ামাত্রই অত-অত যে উপাদেয় খাবার, সব যেন অ্যানটোনিওদের সামনে থেকে উধাও হয়ে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।

মুখের গ্রাস হারিয়ে তারা হা-হুতাশ করবে কী, দৈত্যের গর্জন শুনে তারা ভয়ে কাঁপছে তখন। দৈত্য তাদের মনে করিয়ে দিচ্ছে সেই কত-কালের পুরোনো সব কথা—"বলি আজ যে নির্লজ্জের মত এসে রাজভোগ খেতে বসেছিস, পুরোনো দিনের মহাপাপের কথা কি কিছুই তোদের মনে পড়ে না? সেই নির্দোষ প্রস্পেরো আর তাঁর শিশুকন্যার কথা? মনে নেই কীভাবে তোরা সাগরে ভাসিয়ে দিয়েছিলি তাদের? তাদের মেরে ফেলাই ত তোদের মতলব ছিল। একান্ত নিষ্ঠুর তোরা, পিশাচ ছাড়া তোরা আর কিছুই নোস্। এখানে এই জনহীন দ্বীপে না-খেয়ে মরাই তোদের নিয়তি, সেই নিয়তির জন্য তোরা তৈরী থাক্।"

এই রকম তর্জন-গর্জন করে দৈত্যবেশী এরিয়েল একসময় আবার অদৃশ্য হয়ে গেল। আড়াল থেকে দেখতে লাগল—নিজেরা মৃত্যুর মুখোমুখি এসে দাঁড়াবার পরে মহাপাপীদের মনে অতীত পাপের জন্য অনুতাপ আসে কি-না।

সত্যই অনুতাপ এল অ্যানটোনিও আর নেপল্‌সের রাজার। এতদিন পরে তাদের মনে হল—সত্যিই নিরপরাধ নিরীহ প্রস্পেরোর প্রতি অতি অন্যায় আচরণই করা হয়েছে সেদিন। সে আচরণ দানবের, সে আচরণ পিশাচের, মানুষের আচরণ তাকে কখনোই বলা যায় না।

এতদিনে অভাগাদের মনে অনুতাপ এল সেই বহুদিন আগেকার মহা-পাপের জন্য। অশ্রু এল চোখে, বুক ভেঙে বেরুল হা-হুতাশ। আসন্ন মরণের চেয়ে মরণের পরে নরকের ভয় তাদের কাতর করে ফেলল বেশী। চোখের জলে ভাসতে ভাসতে তারা দেবতার কাছে পাপের মার্জনা ভিক্ষা করতে লাগল।

এই পর্যন্ত দেখে এরিয়েল ছুটে গেল প্রস্পেরোর কাছে সব বিবরণ জানাতে।

সব কথা বলে এরিয়েল অবশেষে নিবেদন করে, "তাদের অনুতাপ কুমিরের কান্না নয়। খাঁটি বলেই মনে হয়। তাঁদের অনুতাপে আমার মত ভূতেরও করুণা হয়।"

প্রস্পেরো বলেন, "প্রেত হয়েও তোমার যদি দয়া হয়, তাহলে আমারও নিশ্চয় মন গলবে। কারণ আমি ত মানুষ! তুমি তাদের এখানে নিয়ে এস।"

এরিয়েল ফিরে আসে নেপল্‌সের রাজা ও অ্যানটোনিওর কাছে। অলক্ষ্যে থেকে সে গান করতে থাকে। নেপল্‌সের রাজা ও অ্যানটোনিও

বিস্মিত হয়ে গানের শব্দ অনুসরণ করেন। তাঁদের পেছনে যান রাজসভাসদ্ গঞ্জালো।

এই সেই গঞ্জালো যিনি প্রস্পেরোর নৌকায় খাবার, বই ও আরও নানা জিনিস গোপনে তুলে দিয়েছিলেন। অলৌকিক সব ব্যাপার দেখে, ভয়ে আর দুঃখে তাঁরা এমনি কাতর হয়ে পড়েছিলেন যে, তাঁরা প্রস্পেরোর কাছে এসেও কেউ তাঁকে চিনতে পারলেন না।

গঞ্জালোকে প্রস্পেরো নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, "গঞ্জালো, তুমি আমার উপকারী বন্ধু, আমার প্রাণদাতা!"

পরিচয় পেয়ে অ্যানটোনিও আর নেপল্সের রাজা লজ্জায় ও দুঃখে মুষড়ে পড়েন।

অনুতাপে অ্যানটোনিওর চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসে। তিনি বড় ভাই প্রস্পেরোর কাছে ক্ষমা চান। নেপল্সের রাজাও গভীর দুঃখ প্রকাশ করেন। প্রস্পেরোকে নির্বাসিত করার কথা মনে করে তিনিও খুব লজ্জিত এখন। তাঁদের লজ্জা বা দুঃখের মধ্যে কোন খাদ ছিল না। তাঁরা প্রস্পেরোকে তাঁর রাজ্য আবার গ্রহণ করতে অনুরোধ করলেন।

প্রস্পেরো সর্বান্তঃকরণে তাঁদের ক্ষমা করেন। নেপল্সের রাজাকে বলেন, "আপনাকে আমি এক মূল্যবান উপহার দেব।" এই বলে তিনি ঘরের দরজা খোলেন। পাশের ঘরে মিরাণ্ডা ও ফার্ডিন্যাণ্ড দাবা খেলছিল। সে দৃশ্য দেখে নেপল্সের রাজা বিস্ময়ে ও আনন্দে নির্বাক হয়ে যান।

বাবাকে দেখে ফার্ডিন্যাণ্ড ছুটে আসে। বাবাও ছেলেকে জড়িয়ে ধরেন। দুজনেই জানতেন যে দুজনে ডুবে মরে গেছেন। এখন দুজনেই বেঁচে আছেন দেখে দুজনের আনন্দ আর ধরে না।

মিরাণ্ডার রূপ দেখে নেপল্সের রাজা তাকে এই দ্বীপের দেবী বলে অনুমান করেছেন। সেই অনুমানে তিনি বলেন, "এই দেবীর দয়াতে আমরা ছাড়াছাড়ি হয়েও আজ আবার একজায়গায় জড় হয়েছি।"

ফার্ডিন্যাণ্ড তার বাবার ভুল ভেঙে দেয়। সে বলে, "রূপে গুণে দেবীর মত হলেও মিরাণ্ডা তোমার আমারই মত মানুষ। ডিউক প্রস্পেরোর মেয়ে। ভেবেছিলাম, তুমি বেঁচে নেই। তাই তোমার মত না নিয়েই আমি একে বিয়ে করব ঠিক করেছিলাম।"

একথা শুনে নেপল্সের রাজা খুবই খুশী হলেন। ঠিক হল, দেশে ফিরে খুব ঘটা করে ওদের বিয়ে হবে।

রাজ্য ফিরে পাবেন, মেয়ে নেপল্‌সের রানী হবে—প্রস্পেরো খুবই খুশী হন। ক্যালিবানকে তিনি আদেশ করেন খুব ভাল করে অতিথিদের জন্য রান্না করতে।

জাহাজ তীরেই ছিল। মাল্লারা ছিল জাহাজে। সে কথা প্রস্পেরো নেপল্‌সের রাজাকে বললেন। তার পরদিন দ্বীপ ছেড়ে চলে যাওয়া ঠিক হল। যাওয়ার আগে প্রস্পেরো এরিয়েলকে মুক্তি দিলেন।

স্বাধীনতা পেয়ে এরিয়েল খুবই খুশী। যেখানে সেখানে পাখির মত সে ঘুরে বেড়াবে। কারও আদেশে তাকে এক জায়গায় বসে থাকতে হবে না। কিন্তু মুক্তি নেবার আগে সে বলে, "আপনাদের নিরাপদে দেশে নিয়ে যাওয়ার ভার আমার। আপনারা দেশে পৌঁছালে আমি বিদায় নেব।" সে ভূত হলেও কৃতজ্ঞতা তার আছে।

দেশে ফিরে প্রস্পেরো জাদুদণ্ড ও বইগুলি মাটির মধ্যে পুঁতে ফেললেন। ভবিষ্যতে তিনি আর কখনো সেসব ব্যবহার করবেন না।

এরিয়েল মুক্ত হয়ে বাতাসে বাতাসে আনন্দে গান গেয়ে বেড়ায়। আজও বাতাসে কান পেতে থাকলে তার গান শোনা যায়।



এ্যাজ্ ইউ লাইক ইট

ইউরোপে ফ্রান্স ও বেলজিয়ামের মাঝ বরাবর অনেক যোজন জুড়ে রয়েছে আর্ডেন বন। এই মহাবনের নানা অংশে নানা রাজ্যের সীমানা ছুঁয়েছে। বহু বিচিত্র সমাবেশে ভরা এই গহন বনের কোথাও মানুষখেকো জানোয়ারেরা বিচরণ করছে, কোথাও বা কোকিল ডাকছে ফুলেভরা মনোরম উপবনে, আর কোথাও বা দু-চার ঘর মেষপালক বসবাস করছে তাদের মেষপাল নিয়ে! এখানে আছে পাহাড়, ঝরনা ও নদী আর আছে সবুজ ঘাসে-ঢাকা ভেড়া চরাবার মাঠ। বাইরের পৃথিবীর সাথে কোন ধরা-বাঁধা যোগাযোগ না রেখেও এখানকার বাসিন্দারা নিজেদের গণ্ডির ভিতরে কোনগতিকে সুখে-দুঃখে জীবন কাটিয়ে দিচ্ছে।

আর্ডেন বনের সীমানা ছুঁয়ে গেছে একটি ছোট রাজ্য। এই রাজ্যের রাজার উপাধি ডিউক। রাজা অতি সদাশয় ব্যক্তি, কিন্তু তাঁর ছোট ভাই ফ্রেডারিক অতি স্বার্থপর, অতি ফন্দিবাজ। নিজের সুবিধার জন্য যে-কোন অন্যায় কাজ করতে তাঁর বিবেকে বাধে না।

ডিউক নিজে সরল ও উদার, তাই পৃথিবীর সবাইকেই নিজের মত ভাল বলে মনে করেন। ছোট ভাই ফ্রেডারিককে প্রাণের মত ভালোবাসেন তিনি। রাজ্যের শাসনভার তাঁরই হাতে ছেড়ে দিয়ে নিজে ধর্মকর্মের কথা নিয়ে ও নির্দোষ আমোদ-প্রমোদে দিন কাটিয়ে দেন।

ফ্রেডারিক দেখলেন,—ডিউকের এই সরল বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে অতি সহজেই তাঁর রাজ্য কেড়ে নেওয়া যায়। তিনি তলে তলে ফন্দি আঁটতে শুরু করলেন। নিজের মতই খারাপ লোক দু-চারজন খুঁজে বার করে তাদের একে একে রাজ্যের বড় বড় পদে বসিয়ে দিতে তাঁর পক্ষে একটুও অসুবিধা হল না।

ডিউক কোন কিছুই খেয়ালই করলেন না। কি করে অল্পদিনের ভিতর ফ্রেডারিক ও তাঁর গুটিকয়েক অনুচরের হাতে রাজ্যের সমস্ত কর্তৃত্ব ও রাজশক্তি এসে জড় হল, কেউই তা টের পেল না। নিজেকে ষোল-আনা তৈরী করে ফ্রেডারিক এবার নিজের মুখোশ খুলে ফেললেন। তাঁর আসল চেহারা দেখে চমকে গেল রাজ্যের লোকেরা, কেঁপে উঠলেন ডিউক।

রাজ্য-রাজপুরী সব দখল করে বসলেন ফ্রেডারিক। সৈন্যেরা সব ফ্রেডারিকের হুকুমে ওঠে বসে, ডিউকের আদেশ একজন সৈন্যও মানে না। এখানে থাকলে জীবন বাঁচানো যাবে না বুঝতে পেরে ডিউক রাজ্য ছেড়ে পালিয়ে গেলেন আর্ডেন বনে। কয়েকজন সভাসদ্, যারা সদাই তাঁর সঙ্গে থাকে, একান্ত ভালোবাসে তাঁকে, তাদের ছাড়া আর কাউকেই তিনি সঙ্গে নিতে পারলেন না, এমন কি, নিজের মা-হারা একমাত্র ছোট্ট মেয়েটিকেও না।

ডিউকের মেয়ের নাম রোজালিণ্ড। এমন রূপসী এই মেয়েটি, এমন মধুর তার স্বভাব যে পাষণ্ড ফ্রেডারিকও তাকে হত্যা করতে পারলেন না। তাকে রেখে দিলেন নিজের মেয়ে সিলিয়ার সঙ্গিনী করে। সিলিয়ার বয়স প্রায় রোজালিণ্ডেরই সমান। কিন্তু রোজালিণ্ডের মত অত লম্বা সে নয়, আর রোজালিণ্ডের মত অত রূপও তার নেই।

দুই বোনের ভালোবাসা অতি গভীর। বয়স তাদের যতই বাড়ে, সেই ভালোবাসা ততই গভীর হয়। শেষে এমন অবস্থা দাঁড়াল যে একে অন্যকে না দেখতে পেলে এক দণ্ড স্থির থাকতে পারে না। সিলিয়ার প্রাণঢালা ভালোবাসা রোজালিণ্ডের সব দুঃখবেদনা ঘুচিয়ে দিল একেবারে। পিতা যে তার রাজ্য হারিয়ে বনে বনে ঘুরছেন, নিজে রাজকন্যা হয়েও সে যে এখন অপরের দয়ার উপর জীবনধারণ করছে, এসব দারুণ লজ্জার কথাও যেন তার মন থেকে একেবারে মুছে দিয়েছে সিলিয়া!

* * *

রাজ্যহারা ডিউকের সব চেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন সার রোলাণ্ড ডি-বয়। তাঁর স্ত্রী তিনটি ছেলে রেখে অনেক দিন আগেই মারা যান। ছেলে তিনজনের নাম—অলিভার, জ্যাক্স ও ওর্লাণ্ডো। ডিউক রাজ্য ছেড়ে পালাবার কিছুদিন আগে সার রোলাণ্ডও মারা যান। জ্যেষ্ঠ অলিভারই অন্য দুভাইয়ের চেয়ে বয়সে বেশ বড়, তাই ভাইরা ছোট বলে সে এখনও সমস্ত পৈতৃক সম্পত্তি দেখাশোনা করে। সম্পত্তি তো কম নয়! অফুরন্ত টাকাকড়ি আর অনেক জায়গা-জমির মালিক ছিলেন সার রোলাণ্ড।

অলিভার মেজভাই জ্যাক্সকে কোনরকমে দেখতে পারলেও ছোটভাই ওর্লাণ্ডোকে মোটেই সহ্য করতে পারত না। জ্যাক্সকে সে বিদ্যালয়ে পাঠায়, বড়লোকের ছেলেদের মত জামা তাকে কিনে দেয়, কিন্তু ওর্লাণ্ডোকে ছেঁড়া জামা পরে খামারে কাজ করতে বাধ্য করে। তাকে বিদ্যালয়ে যেতে মানা করেছে সে। নিজের চেষ্টায় বাড়িতে বসে ওর্লাণ্ডো যা শিখেছে সেইটুকুই তার বিদ্যা। কিন্তু মা সরস্বতী নিজে এসে তার কলমের ডগায় বসেন সময়ে সময়ে। তখন সে যা লেখে তাই হয় কাব্য। ভাবের গভীরতায়, ছন্দের মাধুর্যে তা হয়ে ওঠে অতি চমৎকার।

ওর্লাণ্ডোর শরীরটিও যেমন সুন্দর, তেমনি বলবান। অলিভারের আদেশে সাধারণ চাকরদের মতই তাকে খেতখামারে, মেষ-চরানোর মাঠে ঘুরে ঘুরে মেহনতের কাজ করতে হয়। আর তাতে শরীর হয়েছে তার মজবুত, পেশী হয়েছে শক্ত। শরীর সে তার কত বলবান হয়েছে, তা যেদিন প্রকাশ পেল, সেদিন অবাক্ হয়ে গেল সবাই।

রাজসভায় আছে এক মাইনে-করা কুস্তিগীর—নাম তার চার্লস। মাঝে মাঝে সে গোটা দেশের লোককে আহ্বান জানায়—যার খুশি সে এসে তার সঙ্গে কুস্তি লড়তে পারে। আগে আগে অনেকে তার সঙ্গে কুস্তি লড়তে আসত, কিন্তু সে পরাজিত কুস্তিগীরদের হাড়গোড় ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেয় বলে এখন খুব কম লোকই তার সাথে কুস্তি লড়তে আসে।

এবার চার্লস নিয়মমাফিক কুস্তির আহ্বান জানালে এক বুড়ো চাষার তিনজন বলিষ্ঠ ছেলে এগিয়ে এল। আর এগিয়ে এল ওর্লাণ্ডো—বড়ঘরের ছেলে হয়েও যে গরিবের মত মানুষ হচ্ছে।

কুস্তি লড়বার দিনই দারুণ ঝগড়া হয়ে গেল বড় ভাই অলিভারের সঙ্গে ওর্লাণ্ডোর। অলিভার কৈফিয়ৎ চেয়েছিল কেন ওর্লাণ্ডো কাজে না গিয়ে সকালে চুপচাপ বসে আছে। বড় ভাইয়ের কাছে দিনের পর দিন খারাপ

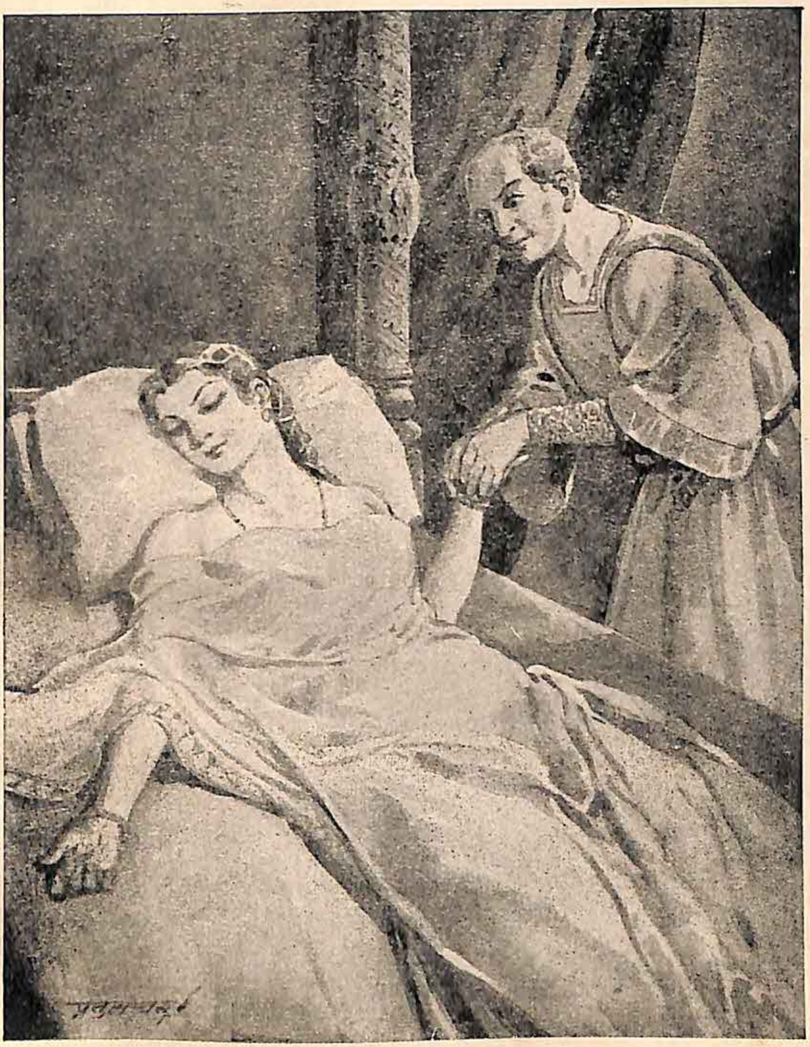
ব্যবহার পেতে পেতে ওর্লাণ্ডোর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল সেদিন। সে কড়া কড়া কথা শুনিয়ে চেঁচিয়ে বলল, "আমিও কি সার রোলাণ্ডের ছেলে নই? তাঁর সম্পত্তির উপর আমারও কি কোন দাবি নেই? তবে কেন আমায় ছেঁড়া জামা পরে চলাফেরা করতে হয়? কেন আমি উপযুক্ত শিক্ষার সুযোগ পাই না?"

এ-রকম মুখের উপর স্পষ্ট প্রতিবাদ অলিভার আগে কখনো শোনেনি। যে চিরদিন মুখ বুজে সব অত্যাচার সয়েছে, সে আজ হঠাৎ যে এমন করে রুখে দাঁড়িয়ে কৈফিয়ত চাইবে, এটা আশাও করেনি অলিভার। তাই তার দারুণ রাগ হয়ে গেল। রাগ দমন করতে না পেরে সে মেরে বসল ছোট ভাইকে। ওর্লাণ্ডোও আজ চুপ করে বসে রইল না, সেও হাত গুটিয়ে এগিয়ে এল দাদার দিকে।

দুই ভাইয়ের মধ্যে হাতাহাতি হবে দেখে বাড়ির সবচেয়ে পুরানো চাকর অ্যাডাম কোথা থেকে ছুটে এসে দুই ভাইয়ের মাঝে দাঁড়াল এবং তাদের স্বর্গীয় পিতা সার রোলাণ্ডের দোহাই দিয়ে থামিয়ে দিল তাদের। ওর্লাণ্ডো দাবি করল, হয় তাকে ভদ্রলোকের মত থাকতে দিতে হবে, নয়তো তাকে তার বাবার সম্পত্তির ন্যায্য অংশ ভাগ করে দিয়ে দিতে হবে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও অলিভারকে ছোট ভাইয়ের এই দাবিতে সায় দিতে হল।

ওর্লাণ্ডোকে একরকম টেনে নিয়ে বাড়ির বাইরে চলে গেল অ্যাডাম। তারপরই অলিভারের কাছে এল কুস্তিগীর চার্লস। সে অলিভারকে বলল, "এ কি শুনছি সার অলিভার? আপনার ছোট ভাই নাকি আমার সঙ্গে কুস্তি লড়তে আসছেন আজ? ভয়ানক কথা যে! আপনি তো জানেন —আমার সঙ্গে যারা লড়ে, তারা হাত-পা ভেঙে চিরজীবনের মত অকেজো হয়ে যায় একেবারে। আপনার ভাই বলে তো আমি তাকে রেহাই দিতে পারি না! কুস্তির লড়াইয়ে জিততে আমাকে হবেই। না জিতলে আমার মান যাবে, চাকরি যাবে, অন্ন যাবে। আর জিততে হলেই আমায় প্রতিযোগীদের হাত-পা ভেঙে দিতে হবে। তাই আপনার কাছে ছুটে এসেছি। আপনি যদি নিজের ভাইকে বাঁচাতে চান, তাঁকে থামান। আমার সাথে লড়তে এলেই মারা পড়বেন তিনি।"

অলিভারের খোলাখুলি জবাব শুনে আশ্চর্য হয়ে গেল চার্লস। অলিভার বলল, "ও ভাই আমার অতি অবাধ্য, অসৎ, গোঁয়ার আর বদমাশ।



আয়াকিমো অতি সন্তর্পণে নিদ্রিতা আইমোজেনের হাত থেকে
খুলে নিল সেই কংকণখানি।

তুমি ওর হাত-পা ভাঙতে চাও তো ভাঙো। যদি মেরে ফেলতে পার, তাহলে আরও ভাল হয়, তোমায় বখশিস দেব আমি।"

চার্লসের এতে মোটেই আপত্তি নেই। সে রাজী হয়ে চুক্তি করে গেল—ওর্লাণ্ডোকে কুস্তির সময় একেবারে প্রাণে মেরে ফেলে সে এসে যথেষ্ট পুরস্কার নেবে অলিভারের কাছে।

ঠিক সময়ে কুস্তি আরম্ভ হল। বুড়ো চাষার তিন ছেলে একে একে চার্লসের সঙ্গে কুস্তি লড়ল। চাষার ছেলেরা বলবান বটে, কিন্তু পেশাদার কুস্তিগীরের সঙ্গে লড়তে হলে শারীরিক বলের সঙ্গে সঙ্গে কুস্তির প্যাঁচ জানা দরকার। সে দক্ষতা তাদের ছিল না, তাই একে একে তিনজনেই হেরে গেল। চার্লস তাদের প্রত্যেকেরই পাঁজরার হাড় দু-চারখানা করে ভেঙে দিল। আধমরা ছেলেদের নিয়ে তাদের বুড়ো বাবা কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরে গেল।

তারপর চার্লসের সঙ্গে ওর্লাণ্ডোর কুস্তি লড়বার কথা।

তিন তিনবার একই জায়গায় কুস্তির লড়াই হওয়ায় জায়গাটা খারাপ হয়ে গেছে। তাই ফ্রেড়ারিক হুকুম দিলেন—এবারকার কুস্তির লড়াই হবে তাঁর প্রাসাদের সামনের মাঠে। একথা শুনে সবাই চলে এল রাজবাড়ির মাঠে।

সেই মাঠে তখন বেড়াচ্ছিল রোজালিণ্ড আর সিলিয়া। কুস্তির আয়োজন দেখে তারাও দেখবার জন্য দাঁড়িয়ে গেল। তারা ভাল করেই জানত যে চার্লস এদেশের সেরা কুস্তিগীর বলে এতদিন এ দেশের অন্য কোন কুস্তিগীরই তার সঙ্গে কুস্তির লড়াইয়ে জিততে পারেনি। বরং চার্লসের সাথে কুস্তি লড়তে এসে হাড়গোড় ভেঙে কেউ কেউ সারাজীবন পঙ্গু হয়েছে, কেউ-বা একেবারে যমের বাড়ি পাড়ি দিয়েছে। কিছুক্ষণ আগে যে একজন চাষার তিনটি বলিষ্ঠ ছেলে চার্লসের সঙ্গে লড়াইয়ে হাড়গোড় ভেঙেছে, সে খবরটাও তাদের কানে এসেছে। তাই এই রকম দুর্ধর্ষ চার্লসের সঙ্গে ওর্লাণ্ডোর মত একজন তরুণ সৌম্যদর্শন ভদ্রলোকের ছেলেকে কুস্তি লড়তে আসতে দেখে তারা দুজনে বড়ই ব্যথিত হয়ে পড়ল। তারা ওর্লাণ্ডোর ভবিষ্যৎ ভেবে চিন্তায় আকুল হল। তারা ভাবল—ওর্লাণ্ডোর ভাগ্যেও নিশ্চয়ই ঐ-রকম একটা-কিছু ঘটবে।

ফ্রেডারিকের মনের ভাবও কতকটা তাই। তিনিও চান না যে এমন সৌম্যদর্শন ছেলেটি একটা খেয়ালের বশে এত কমবয়সে মারা পড়ে। তিনি

তাই রোজালিণ্ড ও সিলিয়াকে বললেন, "দেখ! তোমরা যদি বুঝিয়ে ওকে থামাতে পার, তবে ভালই হয়। আমিও চাই না যে ওই ছেলেটি মারা পড়ুক চার্লসের হাতে।"

তখন ওর্লাণ্ডোকে ডেকে রোজালিণ্ড ও সিলিয়া বোঝাতে লাগল। সিলিয়া একরকম চুপ করেই রইল, বোঝাবার ভার রোজালিণ্ডের উপরই পড়ল ষোলআনা। রোজালিণ্ড অনেক করে বোঝাবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু ওর্লাণ্ডো বুঝেও বোঝে না। ওর্লাণ্ডো বলল—হারতে যদি হয়ই, এমন কি যদি তার হাত-পা ভাঙে বা মরণও হয়, তাতেও তার দুঃখ নেই, কারণ দেশের অত-বড় জমিদারের ছেলে হয়ে কেনা গোলামের মত বেঁচে থাকা আর তার সহ্য হচ্ছে না, তাই এ অপমানের শেষ হয়ে যাক, অনেক দিন বেঁচে থেকে এ অপমান সইতে সে আর রাজী নয়।

রোজালিণ্ড তার সুন্দর চেহারায় আকৃষ্ট হয়েছিল আগেই, এখন তার মিষ্টিমধুর কথা বলার কায়দা তাকে একেবারে মুগ্ধ করে ফেলল। তার উপর ঐ সব দুঃখের কথা। মানুষের দুঃখ তরুণীর অন্তরকে যেমন গলিয়ে দিতে পারে, তেমনটি আর কিছুই পারে না।

কিন্তু কুস্তির লড়াই আর থামিয়ে রাখা যায় না। চার্লস তাড়া দিতে লাগল। সে ভাবছে, রাজকন্যাদের মিষ্টি কথা শুনে ওর্লাণ্ডো যদি লড়াই থেকে পিছিয়ে পড়ে, তাহলে অলিভারের কাছ থেকে পুরস্কার আর সে পাবে না। সে তাই ঠাট্টার বুকনি ছাড়তে লাগল ঘন ঘন—সে যেন বলতে চায় যে প্রাণের ভয়ে ওর্লাণ্ডোই তরুণী রাজকন্যাদের আড়ালে লুকোতে চাইছে।

সারা শহরের লোক ভিড় করে দাঁড়িয়েছে। ওর্লাণ্ডো যে সার রোলাণ্ডের পুত্র, এ পরিচয় অবশ্য এখানে একমাত্র চার্লস ছাড়া আর কেউ জানে না। ওর্লাণ্ডো তো মাঠে মাঠেই ঘুরেছে এতকাল। নাগরিকদের সঙ্গে তার দেখাই হয়নি কখনও। তবু তার কম বয়স আর বলিষ্ঠ সৌম্য চেহারার দিকে তাকিয়ে সবাই ভাবতে লাগল যে বেচারা যদি চার্লসের হাতে মারা না পড়ে তো ভাল হয়।

এবার ফ্রেডারিকের হুকুমে কুস্তির লড়াই শুরু হল।

চার্লসের দেহে শক্তি আছে, কুস্তির প্যাঁচ তার জানা আছে, তার মনে মনে বিশ্বাস আছে যে সে জিতবেই। কিন্তু ওসব দিক দিয়ে ওর্লাণ্ডোও কমতি নয়। তারও দেহে শক্তি আছে, মনেও বিশ্বাস আছে, কেবল কুস্তির প্যাঁচ তার

কম জানা আছে, কিন্তু সে-অভাব পূরণ করেছে তার জেদ। সে আজ মরিয়া! নিজের প্রাণ বাঁচাবার কোন চেষ্টা না করে যে লড়াই করে, তাকে হারানো যে-কোন লোকের পক্ষে শক্ত হয়। চার্লস চায় বাঁচতে, পুরস্কার পেতে, কাজেই সে সতর্ক হয়ে লড়ছে।

আঘাত আর পালটা আঘাত কিছুক্ষণ চলবার পর ওর্লাণ্ডোর আক্রমণ আর সইতে না পেরে চার্লস উলটে পড়ে গেল মাটিতে।

দর্শকরা হতভম্ব! উপস্থিত হাজার হাজার লোক চমকে গেল একেবারে। এমনটা যে হবে, তা কেউ ভাবতেও পারেনি!

ফ্রেডারিক খুশী! এই সৌম্যদর্শন ছেলেটি নিহত বা আহত হলে তিনি দুঃখিত হতেন। তিনি ওর্লাণ্ডোর খুব প্রশংসা করলেন, তারপর জিজ্ঞাসা করলেন তার পরিচয়। ওর্লাণ্ডো স্বর্গীয় স্যার রোলাণ্ডের ছেলে—একথা শুনেই ফ্রেডারিকের মুখ কালো হয়ে গেল। মনের ভাব গোপন করতে না পেরে বলেই ফেললেন তিনি "তুমি অন্য কারো ছেলে হলে আমি খুশী হতাম।" তারপর চমকদার কিছুই যেন হয়নি, এমনি একটা ভাব দেখিয়ে মুখ ফিরিয়ে চার্লসের খবর নেবার জন্য সেদিকে চলে গেলেন।

আর রোজালিণ্ড! সে তো আনন্দে আটখানা। ওর্লাণ্ডো তার বাবার একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর ছেলে—এ কথা শুনে সে আরও খুশী হল। ছেলেটির সঙ্গে নিজের বাবা যা ব্যবহার করলেন তা দেখে সিলিয়া খুবই লজ্জিত, কিন্তু ছেলেটি জেতায় তারও আনন্দ কম হয়নি। সে বুঝতে পেরেছে যে এই তরুণ ছেলেটির সঙ্গে খানিকক্ষণ আগে আলাপ করে রোজালিণ্ড মুগ্ধ হয়েছে, তাকে ভালোবেসে ফেলেছে—আর এখন কুস্তির লড়াইয়ে ছেলেটি জিতেছে বলে রোজালিণ্ড আরও বেশী আনন্দ পেয়েছে। তাই সে রোজালিণ্ডকে বলল এগিয়ে গিয়ে ওর্লাণ্ডোকে অভ্যর্থনা করতে।

ওর্লাণ্ডোকে কাছে ডেকে এনে রোজালিণ্ড নিজের গলার রত্নহার তাকে পরিয়ে দিল। আরও অনেক কিছু কথা সে বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু বাবাকে এদিকে একনজরে তাকিয়ে থাকতে দেখে সিলিয়া রোজালিণ্ডকে টেনে নিয়ে প্রাসাদের ভিতরে চলে গেল।

চার্লস সেই যে উলটে পড়ে গিয়েছিল, সেই থেকে সে অজ্ঞান হয়েই আছে। তাকে সুস্থ করে তুলবার জন্য ফ্রেডারিক হুকুম দিলেন তাঁর লোকদের।

* * *

চার্লসকে হারিয়ে, রাজকন্যা রোজালিণ্ডের গলার রত্নহার উপহার পেয়ে ওর্লাণ্ডোর মন খুশীতে ভরে গেছে। বাড়ির দিকে রওনা হবার মুখে লী-বো নামে রাজসভার এক যুবক সভাসদের সঙ্গে ওর্লাণ্ডোর আলাপ হল। লী-বো ছিল বীর ও উদার। ওর্লাণ্ডোর বাহুবল ও সাহস দেখে সে খুশী হয়েছে, কিন্তু শেষের দিকে তার প্রতি ফ্রেডারিকের মনোভাব দেখে সে ভয় পেয়েছে। সে ভাল করেই জানত যে ফ্রেডারিক যার উপর রেগে যান, তার সর্বনাশ না করে ছাড়েন না। তাই সে ওর্লাণ্ডোকে চুপি চুপি পরামর্শ দিল, "আপনি একটুও দেরি না করে এ রাজ্য ছেড়ে চলে যান। বিলম্বে বিপদ হবে আপনার। ডিউক আপনার উপর ভীষণ রেগে গেছেন।"

এই কথা বলেই লী-বো তাড়াতাড়ি অন্য দিকে চলে গেল।

ওর্লাণ্ডো আকাশ থেকে পড়ল একেবারে। এমন কী দোষ সে করেছে যার জন্য দেশের রাজা তার উপর রেগে যেতে পারেন? কিছুই বুঝতে না পেরে ধীরে ধীরে সে বাড়ির দিকে পা চালিয়ে দিল।

বাড়ির ভিতর ঢুকতে যেতেই বুড়ো অ্যাডাম পথ আগলে দাঁড়াল তার। অ্যাডাম বললে, "ছোটকর্তা, তুমি এ-বাড়িতে আর ঢুকো না। ঢুকলে তোমার প্রাণ যাবে। আমি জানি বড়কর্তা তোমাকে মেরে ফেলবার জন্য ঐ গুণ্ডা চার্লসের সঙ্গে চুক্তি করেছিলেন। চার্লস তোমাকে মারতে পারেনি, এবার তোমার ভাই-ই তোমাকে মারবে। চার্লসকে তুমি হারিয়েছ, সেই হিংসায় তিনি এখন জ্বলে পুড়ে মরছেন। গোপনে হত্যা করবেন তোমাকে। হয়তো আজ রাতেই তোমার ঘরে আগুন লাগিয়ে তোমাকে ঘুমন্ত পুড়িয়ে মারবেন, আর তা নইলে ছোরা আছে, বিষ আছে—কত কি উপায় আছে গুপ্তহত্যার। তুমি এ বাড়িতে ঢুকো না আর।"

ওর্লাণ্ডোর বাইরে শত্রু, ঘরেও শত্রু। বাইরে দেশের রাজা ফ্রেডারিক, ঘরে নিজের ভাই অলিভার। কোথায় সে এখন যাবে, কেমন করে দিন কাটাবে? বাড়ি ছেড়ে দূরে চলে যেতে হলে পয়সা লাগে, তার হাতে যে এখন একটিও পয়সা সম্বল নেই।

অ্যাডামকে সে-কথা বলতেই সে তার হাতে পাঁচশো মুদ্রা তুলে দিয়ে বললে, "তোমার বাবার কাছ থেকে মাইনে বলে এই মুদ্রা একদিন পেয়েছিলাম। সংসারে আমার তো কেউ নেই, তাই এটা খরচ করবারও

কোন দরকার হয়নি। এটা এখন তুমিই নাও; সুদিন এলে আবার আমায় ফিরিয়ে দিও। তুমি চলে যাও এখান থেকে, আর আমাকেও নিয়ে যাও তোমার সঙ্গে। তোমাকে পালিয়ে যেতে আমি পরামর্শ দিয়েছি বা সাহায্য করেছি—এটা জানাজানি হলে বড়কত্তার হাতে আমারও প্রাণ যাবে। তার চেয়ে আগেভাগে তোমার সঙ্গে পালানোই আমারও ভাল!"

এত দরদ এই পুরোনো চাকরের? এত উঁচু তার মন? ওর্লাণ্ডো মুগ্ধ হয়ে গেল একেবারে, তার কথায় রাজী না হয়ে পারল না। অ্যাডামের হাত ধরে নিজের ভিটে ছেড়ে অজানার পথে সে বেরিয়ে পড়ল। অ্যাডাম বুড়ো, তাই তাকে হাত ধরে না নিয়ে গেলে সে বেশীদূর যেতেই পারবে না।

* * *

ওর্লাণ্ডোর কাছে চার্লস হেরে যাওয়ায় ফ্রেডারিক এবার কষ্ট অনুভব করতে লাগলেন। তাঁর মনে দুশ্চিন্তার ছায়া নেমে এল, বিশেষ করে তাঁর ভাইঝি রোজালিণ্ডের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে ওর্লাণ্ডোর ঘনিষ্ঠ আলাপ হয়েছে দেখে। যে রাজ্যের তিনি রাজা, তার উপর রোজালিণ্ডের যে ন্যায়সংগত দাবি রয়েছে, সেকথা আর তিনি কোনমতেই উপেক্ষা করতে পারেন না। এতদিন রোজালিণ্ড ছোট ছিল, তাই তাঁর কোন ভাবনা-চিন্তাই হয়নি। কিন্তু এখন সে বড় হয়েছে—বিয়ের উপযুক্ত হয়েছে, এখন সে তার বাবার বন্ধুর ছেলে ওর্লাণ্ডোর সঙ্গে মেলামেশা করবে। চার্লসকে হারিয়ে ওর্লাণ্ডো তো এখন একজন জনপ্রিয় বীর। তাছাড়া লী-বো আছে—তাকেও বিশ্বাস করা যায় না। প্রাসাদের ভিতর শত্রুদের একটা দল গড়ে রোজালিণ্ড তাঁর বিপদ ডেকে আনতে পারে।

অনেক ভেবেচিন্তে ফ্রেডারিক ঠিক করলেন যে, রোজালিণ্ডকে আর প্রাসাদে রাখা মোটেই নিরাপদ নয়।

ফ্রেডারিক হাজির হলেন অন্দরমহলে। রোজালিণ্ড আর সিলিয়া তখন একসঙ্গে বসে হাসি-তামাসা করছিল। ফ্রেডারিক সরাসরি হুকুম দিলেন—রোজালিণ্ডকে রাজ্য ছেড়ে চলে যেতে হবে কুড়ি দিনের ভিতর; তা না গেলে প্রাণদণ্ড হবে তার।

ডিউকের হুকুম শুনে দুচোখে আঁধার দেখল রোজালিণ্ড। কোথায়

যাবে সে ? জ্ঞান হয়ে অবধি এই প্রাসাদের বাইরে সে কখনও যায়নি। আজ একাকিনী অজানা অচেনা সংসারের পথে হাজার রকম বিপদের মাঝে কোথায় সে আশ্রয় নেবে ? সে কাতর হয়ে নিজের খুড়োর কাছে দয়া ভিক্ষা করল। সে কোনদিন তাঁর বিপক্ষে কোন ষড়যন্ত্র কারও সঙ্গে করবে না বলে কথাও দিল। কিন্তু ফ্রেডারিক অটল।

তখন বোনের হয়ে সিলিয়া দয়া ভিক্ষা করতে লাগল বাবার কাছে। রোজালিণ্ডকে সে প্রাণের চেয়ে ভালোবাসে, তাকে ছেড়ে থাকতে হলে সারা পৃথিবীটাই তার চোখে আঁধার হয়ে যাবে—একথা সিলিয়া পরিষ্কার করেই তার বাবাকে জানাল। কিন্তু ফ্রেডারিকের মন তবুও নরম হল না। তাঁর কড়া হুকুম আর একবার শুনিয়ে দিয়ে তিনি চলে গেলেন, আর বার বার বলে গেলেন যে, দেশ ছেড়ে না গেলে প্রাণ দিতে হবে রোজালিণ্ডকে।

রোজালিণ্ড একেবারে ভেঙে পড়ল। কিন্তু তাকে সাহস দিল সিলিয়া। বলল, "ভয় কী ? তোমাকে একা একা যেতে হবে না, আমিও যাব তোমার সঙ্গে এই প্রাসাদ ছেড়ে। চিরদিন একসাথে বেড়ে উঠেছি আমরা দুটি বোন —কার সাধ্য আমাদের দুজনকে আলাদা করে ? রাজ্যের বাইরে যেতেই যদি হয়, দুজনেই চলে যাব।"

তখন পরামর্শ হল—দেরি না করে পরদিনই রাতে তারা বেরিয়ে পড়বে অতি গোপনে। সিলিয়া নারীবেশেই অতি সাধারণ পোশাকে যাবে, তার নতুন নাম হবে অ্যালায়েনা। আর রোজালিণ্ড যাবে পুরুষ সেজে, তার নতুন নাম হবে গ্যানিমেড। অবশ্য তাদের সাথে একজন পুরুষ থাকলে ভাল হয়। কিন্তু যাকে-তাকে তো সঙ্গে যেতে বলা যায় না ! অনেক ভেবে সিলিয়া বলল—রাজসভার ভাঁড় টাচ্‌স্টোনকে সঙ্গে নেওয়া যেতে পারে। সে নিরীহ, বিশ্বাসী এবং সিলিয়া-রোজালিণ্ডকে মানে খুব। আর তাকে অনুরোধ করলেই সে তাদের সঙ্গে যাবে।

সেই পরামর্শমতই কাজ হল। টাচ্‌স্টোনকে বলতেই সে রাজী হয়ে গেল। পরদিন গভীর রাতে রোজালিণ্ড ও সিলিয়া রাজ্য ছেড়ে চলে গেল তাকে নিয়ে।

সকালে যখন জানা গেল যে রোজালিণ্ড তো চলে গেছেই, সিলিয়াও তার সঙ্গে চলে গেছে রাজবাড়ি ছেড়ে, তখন ফ্রেডারিক রাগে খেপে উঠলেন। সিলিয়ার ঝিকে ডেকে তিনি জানতে পারলেন যে, আগের

রাতে সিলিয়া ও রোজালিণ্ড অনেকক্ষণ ধরে কথা কয়েছে, আর তারা মাঝে মাঝে ওর্লাণ্ডোর নাম করেছে। তিনি সন্দেহ করলেন যে, ওর্লাণ্ডোর সাহায্যেই রোজালিণ্ড পালিয়েছে, আর বোকা সিলিয়াকে নিয়ে গেছে তার বাপকে জব্দ করার জন্য।

তিনি তখনই ওর্লাণ্ডোকে ধরে আনার জন্য লোক পাঠালেন। ফ্রেডারিকের লোকেরা ওর্লাণ্ডোকে বাড়িতে না পেয়ে খোঁজখবর নিয়ে জানলে যে, ওর্লাণ্ডোও বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে গোপনে। একথা শুনেই ফ্রেডারিক জ্বলে উঠলেন।

ওর্লাণ্ডোকে হাতের মুঠোয় না পেয়ে ফ্রেডারিক ডেকে পাঠালেন তার দাদা অলিভারকে। অলিভার এসে বলল যে ওর্লাণ্ডো তাকে কিছু না বলেই গোপনে বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। ফ্রেডারিক তার কথা বিশ্বাস করলেন না। তাঁর ধারণা যে সার রোলাণ্ডের ছেলেরা সবাই তাঁর বিরুদ্ধে দল পাকিয়েছে। অলিভারকে চেপে ধরলেই ওর্লাণ্ডোর খবর পাওয়া যাবে, এবং সিলিয়াকেও উদ্ধার করা যাবে।

অলিভার কিছুতেই ফ্রেডারিককে বোঝাতে পারল না যে ওর্লাণ্ডোর সঙ্গে তার কিছুমাত্র সদ্ভাব নেই, বরং সেও ফ্রেডারিকের মত ওর্লাণ্ডোর পরম শত্রু। ফ্রেডারিক অলিভারের কোন ওজর না শুনে তার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে তাকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিলেন। তিনি অলিভারকে বললেন, "যদি ওর্লাণ্ডোকে এনে আমার হাতে তুলে দিতে পার, তবেই তুমি ফিরে এসে সম্পত্তি পাবে। তা যদি না পার, এরাজ্যে ফিরলেই জল্লাদের হাতে তোমাকে মরতে হবে।"

সব সম্পত্তি হারিয়ে রাজ্য ছেড়ে চলে গেল অলিভার। এতক্ষণে সে বুঝতে পারল, পাপের সাজা ভগবান দেন। ওর্লাণ্ডোকে যে সম্পদ থেকে সে ফাঁকি দিতে চেয়েছিল, সে-সম্পদ তার নিজের ভোগেও তো এল না।

* * *

আর্ডেনের বিশাল বন। নির্বাসিত ডিউক তার কয়েকজন বন্ধু নিয়ে এরই কোলে আশ্রয় নিয়েছেন। তাঁরা হরিণ শিকার করেন তীরধনু দিয়ে, গাছের ছায়ায় বসে তারই মাংস ভোজন করেন পরম আনন্দে। ডিউকের সহচর অ্যামিয়েন্স এই ধরনের গান গেয়ে গেয়ে বনে বনে ঘোরে ঃ

আমার সাথে
সবুজ গাছের তলে
মিষ্টি পাখির গলে
ঢেলে মধুর সুর
থাকতে যে বা চায়
আসুক না সে হেথায়।
দুর্যোগ-শীত ছাড়ি
দেখবে নাকো অরি

ছেড়ে উচ্চ-আশ
আকাশ-তলে বাস
যে চায় আসুক হেথা
তাতে নেইকো যে বাধা।
খুঁজে পেতে যে যা পায়
তাতে যে সন্তুষ্ট রয়
যাহা জোটে তাহা খায়
আসুক না যে হেথায়।

এভাবে গান গেয়ে অ্যামিয়েন্স সকলকেই ভুলিয়ে রাখে। কত কথাই না গানের মধ্যে সে বলে। সে বলে, "মানুষের সেরা শত্রু মানুষ, কিন্তু এই বনে সে এসে কারও সঙ্গে শত্রুতা করতে পারে না। এস, এস—এই ছায়াশীতল সুন্দরবনে আমার সাথে বসে যদি আনন্দে দিন কাটিয়ে দিতে চাও, এস তবে।"

ডিউকের অন্য সহচর জ্যাক্স আবার দার্শনিক। যা-কিছু চোখে পড়ে, তারই ভিতর তিনি চিন্তার খোরাক পান, তারই চিন্তায় তিনি ডুবে যান জগৎসংসার ভুলে। তিনি হয়ত তীর মেরেছেন হরিণকে, অভাগা পশু হয়ত নিরালা বনের আঁধারে শুয়ে ঝরনার জলে নিজের চোখের জল মেশাচ্ছে, তার খোঁজ করতে গিয়ে জ্যাক্স তাকে দেখলেন, কিন্তু আবার তাকে আঘাত করার কথা ভুলে ডুবে গেলেন গভীর চিন্তায়। সুস্থ সবল হরিণরা দল বেঁধে চলে যাচ্ছে তাদের মরণপথের যাত্রী ওই সঙ্গীর সামনে দিয়েই, কিন্তু তারা কেউ এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে একটু সমবেদনাও ওকে জানিয়ে যাচ্ছে না—এই চিন্তাতেই তিনি তখন কাতর। তিনি তখন ভাবেন—সংসারের নিয়মই এই, যে চাকার তলে পড়ে যায়, তাকে পায়ে দলে যাওয়াই দুনিয়ার নিয়ম, তাকে আত্মীয়তা জানাতে গেলে নিজেও পড়ে যাওয়ার ভয় আছে।

ডিউক অ্যামিয়েন্সের গানও শোনেন, জ্যাক্সের মুখে দর্শনের বড় বড় কথাও শোনেন। কাউকেই নিষেধ করেন না, কাউকেই দেন না বেশী উৎসাহ। রাজ্যসুখ ছেড়ে, আপনার জনদের ছেড়ে এসে যারা বনে তাঁর সঙ্গী হয়েছে, তাদের ইচ্ছামতই চলতে দেন তিনি, তাদের কোন কাজে বাধা দেওয়ার কথাই ভাবেন না তিনি কখনো।

একদিন তিনি বন্ধুদের নিয়ে গাছতলায় খেতে বসেছেন, এমন সময় এক সুন্দর যুবক তরোয়াল হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ল তাঁদের মাঝখানে।

হাতের তরোয়াল বাগিয়ে ধরে যুবকটি চেঁচিয়ে বলল, "কিছু খাবার আমার এখনই চাই আমার সঙ্গী এক বুড়োর জন্য। সে বেচারার এমন ক্ষমতা নেই যে হেঁটে এখানে আসবে। তাকে কোনরকমে পিঠে করে এনে ঐদিকে গাছতলায় আমি শুইয়ে রেখে এসেছি। যদি ভাল কথায় দয়া করে আপনারা খাবার না দেন, তাহলে আমি গায়ের জোরে তা কেড়ে নিতে বাধ্য হব। আমি খিদেয় কাতর হলেও নিজের জন্য কিছুই চাইছি না, আমার উপকারী বন্ধু আমার চোখের সামনে না খেয়ে মরে যাবে, এ আমি কিছুতেই সইতে পারব না।"

ডিউক তাকে মিষ্টকথায় বললেন, "ওহে, যত ইচ্ছা খাবার তুমি তোমার বুড়ো বন্ধুর জন্য নিয়ে যাও। তাকে খাইয়ে তারপর তুমি নিজেও এসে আমাদের সঙ্গে খেতে বসে যাও। তুমি যতক্ষণ ফিরে না আসছ, আমরা কেউই খেতে শুরু করব না।"

ডিউকের কথায় শান্ত হয়ে যুবক খাবার নিয়ে চলে গেল।

এই যুবক হচ্ছে সেই ওর্লাণ্ডো, আর বুড়োটি হল অ্যাডাম। ওরা বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছে আর্ডেনের গভীর বনে। ইচ্ছা ছিল—এই বনটা পেরিয়ে অন্য কোন দেশ গিয়ে জীবিকার একটা উপায় করে নেবে। কিন্তু হঠাৎ তাদের দেখা হয়ে গেল নির্বাসিত ডিউকের সঙ্গে।

খেতে খেতে আলাপ পরিচয় হল। ক্রমে ডিউক জানতে পারলেন যে ওর্লাণ্ডো তাঁরই ঘনিষ্ঠ বন্ধু স্যার রোলাণ্ডের পুত্র। তখন তিনি তাকে পরম সমাদরে আশ্রয় দিলেন নিজের দলে। আর সেই থেকে অ্যাডামকে নিয়ে ওর্লাণ্ডো তাঁরই কাছে আর্ডেনের বনে বাস করতে লাগল।

* * *

আর্ডেনের অপর এক অংশ এক মেষপালকের কুটির কিছুদিন থেকে খালি পড়ে ছিল। কয়েক দিন হল সেখানে এক যুবক ও তার বোন বাস করছে। এ-বনে তাদের আগে কেউ দেখেনি। তাদের সঙ্গে একজন আধবুড়ো পাগলাটে লোকও আছে।

সেই যুবক ও তার বোন সদাই বেড়িয়ে বেড়ায় মাঠে-ঘাটে, উপত্যকায়, আর ঝরনার ধারে, কখনও নিজের মনে গান গায়, কখনও বা নিজেরা হাসি-তামাশা করে, আবার কারও সঙ্গে দেখা হলে অমায়িকভাবে আলাপও তারা করে।

এদের সঙ্গে একদিন দেখা হল ওর্লাণ্ডোর।

বেচারা ওর্লাণ্ডো। সেই কবে একদিন ক্ষণিকের জন্য রোজালিণ্ড ও সিলিয়াকে দেখেছিল, তাই আজ সে এই নতুন জায়গায় নতুন বেশে তাদের চিনতেই পারল না। রোজালিণ্ডের মেয়েলি-চেহারা তার অন্তরে এখনও জ্বলজ্বল করছে সেই কুস্তির লড়াইয়ের দিন থেকে, কিন্তু রোজালিণ্ডের পুরুষবেশী চেহারার মধ্যে সেই মেয়েলি-চেহারার কোন আদলই ওর্লাণ্ডো খুঁজে পেল না। অচেনা পুরুষ মনে করেই তার সঙ্গে আলাপ করতে লাগল।

রোজালিণ্ড কিন্তু তাকে চিনে ফেলল সহজেই, আর তাকে বনের মধ্যে পেয়ে ভারী খুশী হয়ে একদিন তাকে আসতে বলল তাদের কুটিরে।

ওর্লাণ্ডো কবিতা লিখতে পারে।

নিরিবিলি বনের ভিতর ঘোরে ওর্লাণ্ডো, আর তার মনের কথা কবিতার আকারে তার মুখ থেকে বেরিয়ে আসে। মনের কথা আর অন্য কিছু নয়, তার ধ্যানের দেবী রোজালিণ্ডের কথা। তারই নামে সে মুখে মুখে কবিতা রচনা করে, আর কাগজ কলমের অভাবে গাছের বাকলের উপর ছুরি দিয়ে সে কবিতা খোদাই করে রাখে। শেষকালে এমন হল—সারা আর্ডেন বন যেন রোজালিণ্ডের নামের মালা গলায় পরে হাসছে!

রোজালিণ্ড ও সিলিয়া বনে বনে ঘোরার সময় এ-ধরনের কবিতা দেখেছে। সিলিয়া তা নিয়ে পরিহাসও করেছে রোজালিণ্ডকে। কিন্তু ওরা কেউই এতদিন বুঝতে পারেনি যে এসব কবিতার লেখক কে। অবাক্ হয়ে আকাশ পাতাল ভেবে মরেছে শুধু—এই গহন বনে শহরবাসিনী রোজালিণ্ডের উপর এত প্রেম কার?

এখন ওর্লাণ্ডোকে বনের ভিতর দেখতে পেয়ে তারা বুঝতে পারল—কে সেই অজানা কবি।

রোজালিণ্ড তাকে বাড়িতে এনে বকাবকি করে, বলে, "গাছের বাকলে এমন করে ছুরি দিয়ে কেটে কবিতা লেখা—এ শুধু গাছগুলির সর্বনাশ করা। রোজালিণ্ডের সম্বন্ধে তোমার মনে যখন যেভাবের উদয় হবে, তা তুমি তখনই আমাকে বলবে, তাহলেই আর ওরকম গাছের বাকলে খোদাই করে কবিতা লেখার দরকার হবে না।"

ওর্লাণ্ডো সেই থেকে সময় পেলেই ওখানে যায়। পুরুষবেশী রোজালিণ্ডের কাছে তার হৃদয়ের দেবী রোজালিণ্ডের কত কথাই সে প্রতিদিন বলে!

একদিন দুপুর বেলা ডিউকের সঙ্গে খাওয়া শেষ করে সে রোজালিণ্ডের কাছে যাচ্ছে, এমন সময় পথের ওপর এক ভয়াবহ দৃশ্য সে দেখল। জায়গাটা নিবিড় বন। এক গাছের ডালে একজন পুরুষ অচেতন হয়ে ঘুমুচ্ছে, আর তার দেহের উপর দিয়ে এঁকেবেঁকে ফণা তুলে এগিয়ে আসছে এক ভীষণ বিষধর সাপ!

ওর্লাণ্ডো কি করবে ঠিক করে উঠতে পারেনি তখনো। এমন সময়ে সাপটার চোখ পড়লো ওর্লাণ্ডোর উপর, আর ভয় পেয়ে তখুনি সে ঘুমন্ত লোকটিকে ছেড়ে গাছ থেকে নেমে পড়ল। তারপর ধীরে ধীরে ঢুকল গিয়ে লতাপাতার এক নিবিড় ঝোপে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওর্লাণ্ডো দেখছে সাপটাকে। ওটা গিয়ে ঢুকল সেই ঝোপের ভিতর। ওর্লাণ্ডোও সেই ঝোপের ভিতর পর্যন্ত সাপের চলার পথ নজর করতে লাগল। দেখতে দেখতে এমন একটা দৃশ্য সেখানে তার চোখে পড়লো যাতে অমন-যে সাহসী ওর্লাণ্ডো, সেও শিউরে কেঁপে উঠল। ঝোপের ভিতর শিকারের ওৎ পেতে রয়েছে এক প্রকাণ্ড সিংহী!

ঘুমন্ত মানুষকে আক্রমণ করে না সিংহেরা। লোকটা জেগে ওঠামাত্র তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে সিংহী। ওর্লাণ্ডো এতক্ষণে মন ঠিক করে ফেলেছে। বাঁচাতেই হবে লোকটাকে। সে এগিয়ে গেল ওর দিকে। ও তখনো ঘুমে অচেতন।

কিন্তু এগিয়ে গিয়েই ওর্লাণ্ডো তার বড়ভাই অলিভারকে দেখে থমকে দাঁড়ালো। এ দেখে তার দুটো পা যেন আর এগোতে চায় না—যেন শিকড় গেড়ে বসে যায় মাটিতে।

ফ্রেডারিক তাড়িয়ে দেবার পর থেকে অলিভার খুঁজে বেড়াচ্ছে ওর্লাণ্ডোকেই। অলিভারের মতলব—ওর্লাণ্ডোকে ধরিয়ে দিয়ে নিজের বিষয়-সম্পত্তি ফ্রেডারিকের কবল থেকে উদ্ধার করা।

ওর্লাণ্ডো ভাবলো, পিছন ফিরে সে চলে যাবে, কিন্তু যেতে সে পারল না! বিবেকে তার বাধলো।

সে এগিয়ে গেল ঘুমন্ত অলিভারের কাছে। আর ঠিক সেই মুহূর্তে—অলিভার বুঝি ঘুমের ঘোরে নড়ে উঠেছিল একবার—ভীষণ গর্জন করে লাফ দিল সিংহী।

চোখের পলকে তরোয়াল খুলে ওর্লাণ্ডো সিংহীর সামনে রুখে দাঁড়াল।

সিংহীর গর্জনে চমকে উঠে ভয়ার্ত অলিভার যা দেখল—তা সে কল্পনাও করতে পারেনি।

দেখল—সিংহীর মুখ থেকে তাকে বাঁচাবার জন্য জীবনপণ করে সিংহীর সাথে লড়াই করছে তারই ভাই ওর্লাণ্ডো—যাকে সে পীড়ন ও অত্যাচার করে দেশ থেকে তাড়িয়েছে, আর অবশেষে যাকে ধরিয়ে দেবার উদ্দেশ্য নিয়েই সে এসেছে আর্ডেনের এই ভীষণ বনে। অবিরত অনুতাপ আর হা-হুতাশ করতে থাকে অলিভার। নিজেকে সে বারবার ধিক্কার দিতে লাগল।

লড়াইয়ে সিংহী মারা পড়ল বটে, কিন্তু ওর্লাণ্ডো ভয়ানক ভাবে জখম হল সারা দেহে। অলিভার তাকে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে নিয়ে এসে শুইয়ে দিল ওর্লাণ্ডোর আস্তানায়।

কদিন বিশ্রাম আর চিকিৎসার পর একটু সুস্থ হতেই ওর্লাণ্ডো অলিভারকে পাঠাল রোজালিণ্ডের কাছে। ওর্লাণ্ডো সিংহীর আক্রমণে জখম হয়েছে, অলিভারের মুখে এই কথা শুনে রোজালিণ্ডের বুক কেঁপে উঠল। পুরুষের বেশ তাকে পুরুষের মত মনের বল দিতে পারেনি! সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল।

সিলিয়া তাকে শুশ্রূষা করতে লাগল। কিছুক্ষণ বাদে রোজালিণ্ড জ্ঞান ফিরে পেল। এরপর থেকে অলিভারকে প্রায়ই যেতে হত রোজালিণ্ড ও সিলিয়ার কাছে শয্যাগত ওর্লাণ্ডোর অনুরোধে। বারবার যেতে যেতে সিলিয়ার সাথে মেলামেশার ফলে অলিভারের অনুরাগ প্রকাশ পেল। সিলিয়াও অলিভারের প্রতি আকৃষ্ট হল। ক্রমে অলিভার ও সিলিয়া—দুজনে পরস্পরকে ভালবেসে ফেলল।

সিংহীর আক্রমণে ওর্লাণ্ডো ভয়ানক জখম হয়ে পড়ে আছে, তাই ডিউক তাকে দেখবার জন্য তার আস্তানায় মাঝে মাঝে আসেন। একদিন সেখানে এসে অলিভারের মুখে শুনলেন পুরুষবেশী রোজালিণ্ড ও তার বোনের কথা। তাদের সঙ্গে আলাপ করবার ইচ্ছা হল ডিউকের। তাই তাঁর অনুরোধে সেখানে নিয়ে আসা হল তাদের। রোজালিণ্ডকে দেখেই ডিউকের অন্তরে যেন স্নেহ জেগে উঠল!

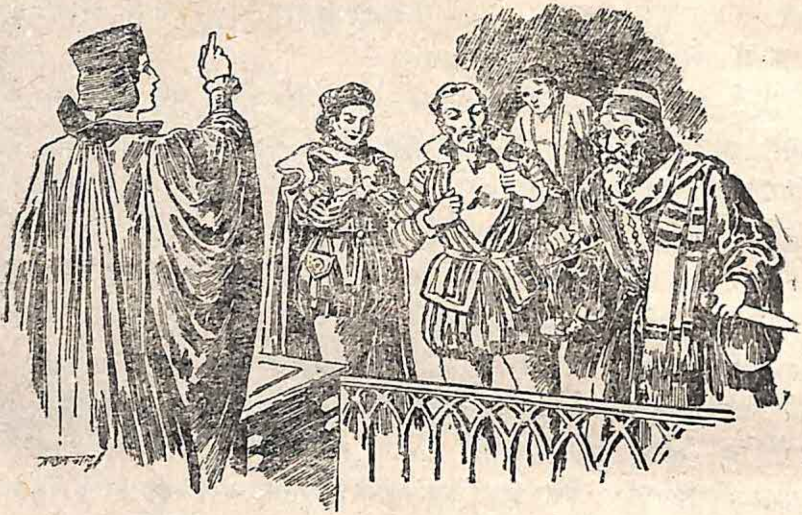
নির্বাসিত ডিউককে দেখে পুরুষবেশী রোজালিণ্ড আর নিজেকে সামলে রাখতে পারল না। কাঁদতে কাঁদতে 'বাবা, বাবা' বলে সে তাঁর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। রোজালিণ্ড ও সিলিয়ার ছদ্মবেশ সকলে জানতে পারল।

ডিউক সব কথাই শুনতে পেলেন—কতক রোজালিণ্ড ও সিলিয়ার মুখে, কতক বা ওর্লাণ্ডো ও অলিভারের মুখে।

তরুণ-তরুণীদের অনুরাগের খবরও পেলেন ডিউক। তাঁর নির্দেশে সেই বনেই ওর্লাণ্ডোর সঙ্গে রোজালিণ্ডের, এবং অলিভারের সঙ্গে সিলিয়ার বিয়ে হয়ে গেল।

ঠিক সেই সময়ে অলিভারের মেজ ভাই জ্যাক্সও এসে হাজির হল সেখানে। সে এসে খবর দিল যে ডিউককে রাজ্য ফেরত দিয়ে ফ্রেডারিক সন্ন্যাসী হয়ে নিরুদ্দেশের পথে চলে গেছেন। এই বলে সে ডিউককে ফ্রেডারিকের লেখা একটি চিঠি দিল। তাতে লেখা আছে যে আর্ডেনের বনে ডিউক এবং রোজালিণ্ড ও সিলিয়া বাস করছে জানতে পেরে ফ্রেডারিক যখন তাঁর সেনাদল নিয়ে বনের দিকে এগিয়ে আসছেন, সেসময় পথে এক ঈশ্বরভক্ত মহাপুরুষের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। সেই মহাপুরুষের উপদেশে তিনি সংসার ছেড়ে চলে যাচ্ছেন ভগবানের আরাধনায়।

ফ্রেডারিকের আশ্চর্য পরিবর্তনের কথা শুনে সবাই বিস্মিত হল। এবার ডিউকের আদেশে সবাই দেশে ফিরে গেল, গেল না কেবল জ্যাক্স। দার্শনিক জ্যাক্স আর্ডেনের আঁধার বনে কী যে সত্যের আলোক পেয়েছে—সে-ই জানে; রাজ্যসুখের লোভেও সে আর আর্ডেন বন ছেড়ে বাড়ি ফিরে গেল না।



মার্চ্যান্ট অফ ভিনিস

সাগরের রানী সুন্দরী ভিনিস নগরী। সাত সাগরের উপর তার শাসন চলে বাণিজ্যের পসরা নিয়ে। ভিনিসের সমুদ্রে তাই হাজারে হাজারে জাহাজ। এখান থেকে কেউ মাল বোঝাই করে বিদেশে যায়, কেউ বা মাল-বোঝাই হয়ে বিদেশ থেকে এখানে আসে। ভিনিসের সওদাগরেরা তাই কুবেরের মত ধনী।

ভিনিসের এসব ধনকুবের সওদাগরের ভেতর ধনে-মানে সবচেয়ে বড় ছিলেন অ্যাণ্টোনিও। তাঁর অগুনতি জাহাজ তুনিয়ার নানা দেশে ঘোরা-ফেরা করে সবসময়। হেন দেশ নেই যেখানে তিনি জাহাজ পাঠান না।

অ্যাণ্টোনিওর নানা গুণ, তার মধ্যে বড় গুণ হল এই যে বন্ধুদের জন্য তিনি না করতে পারেন, এমন কাজ নেই। ভিনিসের বড় ঘরের যুবকেরা সবাই তাঁর বন্ধু। তাদের তিনি সবাইকেই ভালবাসেন, যখন তখন নেমন্তন্ন করে খাওয়ান, দামী দামী জিনিস উপহার দেন, বিপদে পড়ে তাঁর কাছে এসে দাঁড়ালে অ্যাণ্টোনিও টাকাপয়সা দেন তাদের অভাব মেটাবার জন্য।

অভাব সবচেয়ে যাঁর বেশী, তিনিই আবার অ্যাণ্টোনিওর সব চেয়ে প্রিয় বন্ধু। ব্যাসানিও তাঁর নাম। বড় ঘরের ছেলে; রূপে গুণে বিদ্যায়

তাঁর জুড়ি মেলা ভার। টাকাকড়ি তাঁরও কম ছিল না। কিন্তু আজ আর তা নেই। নানা গুণে গুণী হয়েও ব্যাসানিওর এক দোষ—তিনি বেহিসাবী ও বিলাসী। অ্যান্টোনিওর মত পরিশ্রমী নন, ব্যবসা থেকে পয়সা আনার ফিকির তাঁর জানা নেই। বাপের কাছ থেকে যে প্রচুর টাকাপয়সা পেয়েছিলেন, দুহাতে তা তিনি উড়িয়ে দিয়েছেন। বাড়ি ঘর জাহাজ গুদাম বেচে যতদিন ঠাট বজায় রাখা যায়, তা রেখেছেন ব্যাসানিও। তারপর শুরু হয়েছে ধার।

কিন্তু ধার করে আর কত দিন চলে? যারা ধার দেয়; তারা আবার সময়মত ফেরত চায় টাকাটা। দিতে না পারলে অপমান করে। ব্যাসানিও প্রায় সেই অপমান হওয়ার মত অবস্থায় এসে পড়েছেন।

এতদিনের অভ্যাস ছাড়াও যায় না। এতকাল বিলাসে ব্যসনে কাটিয়ে এসে এখন সেই সুখের জীবন দূরে সরিয়ে রেখে দেবেন, আর হঠাৎ পরিশ্রমী ব্যবসায়ী হয়ে দাঁড়াবেন অ্যান্টোনিওর মত সে-আশা তাঁর নেই। টাকাকড়ি তাঁর সবসময় দরকার, কিন্তু সেই টাকাকড়ি পাওয়া চাই বিনা মেহনতে। তা না পেলে এ-জীবন কষ্টের জীবন হয়ে দাঁড়াবে তাঁর কাছে।

অ্যান্টোনিওর কাছে কত যে তাঁর ধার, তার কোন হিসাব নেই। হিসাব অ্যান্টোনিও রাখেননি, রাখেননি ব্যাসানিও। দরকার হলে ব্যাসানিও টাকা চেয়েছেন, অ্যান্টোনিও তা দিয়েছেন।

কিন্তু আজ বিপদ হল।

ব্যাসানিওর টাকা দরকার, কিন্তু অ্যান্টোনিওর হাতে মোটেই টাকা নেই।

এই সবে জাহাজ সাজিয়ে নানা দেশে পাঠিয়েছেন অ্যান্টোনিও। এক একটা জাহাজ মাল বোঝাই করে পাঠানো তো কম টাকার ধাক্কা নয়! শেষ জাহাজখানিকে বিদায় করতে গিয়ে নিজের সব টাকাকড়ি খরচ করে ফেলেছেন অ্যান্টোনিও। এমন সময়ে তাঁর কাছে এসে টাকা চাইলেন ব্যাসানিও।

ব্যাসানিওর এবারকার টাকা-চাওয়ার পিছনে আবার একটা ব্যাপার আছে।

সে-ব্যাপারের সূচনা হয় বেশ কিছুদিন আগে। তখন এমন দৈন্যদশা ঘটেনি ব্যাসানিওর। তাঁর নিজের টাকাকড়ি সেসময় ছিল।

ভিনিস থেকে কিছু দূরে বেলমণ্ট বলে একটি জায়গায় বাস করতেন একজন ভদ্রলোক—অপরিমিত ধনী।

ওদিকটায় বেড়াতে গিয়ে ব্যাসানিও একবার সেই ভদ্রলোকের বাড়িতে কিছুদিনের জন্য অতিথি হয়েছিলেন। সেখানে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হন ভদ্রলোকের একমাত্র মেয়ে পোর্সিয়ার সাথে। ব্যাসানিও দেখেছিলেন—পোর্সিয়ার রূপ ও গুণের তুলনা নেই।

ব্যাসানিওর তখন মনে হয়েছিল—পোর্সিয়া তাঁকে খুবই পছন্দ করেন। তিনি মুখ ফুটে বললে পোর্সিয়া হয়ত তাঁকে বিয়ে করতেও পারেন। কিন্তু তা তিনি করেননি সেসময়। বিয়ে করে সংসারী হওয়ার কোন মতলবই তখন ছিল না তাঁর মাথায়।

ব্যাসানিও বেলমণ্ট থেকে চলে আসার পর কয়েক বৎসর কেটেছে।

কিছুদিন আগে ব্যাসানিও খবর পেয়েছেন যে পোর্সিয়ার বাবা আর বেঁচে নেই। নিজের অতুল ঐশ্বর্য একমাত্র মেয়ে পোর্সিয়ার হাতে দিয়ে গেছেন ভদ্রলোক। তাই পোর্সিয়াকে বিয়ে করার আশায় অনেক রাজপুত্র ও রাজারা ছুটে আসছে বেলমণ্টে।

ব্যাসানিও এসব খবর শুনে অবধি অনুতাপ করছেন। চেষ্টা করলে এই পোর্সিয়াকে কবে তিনিই বিয়ে করতে পারতেন। আর তাহলে আজ আর তাঁকে পয়সার অভাবে কষ্ট পেতে হত না। যে-ভাগ্যবানের গলায় পোর্সিয়া মালা দেবেন, তিনি হবেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধনীদের ভিতর একজন।

কিন্তু নৈরাশ্যের আঁধার ভেদ করে আশার আলোর একটা ক্ষীণ রেখা দেখাও দেয় মাঝে মাঝে। এখনও তো পোর্সিয়ার বিয়ে হয়ে যায়নি! পৃথিবীর চার কোণ থেকে বরেরা এসে বেলমণ্টের বাড়িতে ভিড় করেছে বটে, কিন্তু এখনও তো কারো গলায় পোর্সিয়ার বরমাল্য ওঠেনি! এখনও সময় আছে হয়ত! ব্যাসানিওর বেশ মনে আছে সেই সেবারকার দেখা-সাক্ষাতের সময় পোর্সিয়ার অন্তরে একটু দাগ কাটতে পেরেছিলেন তিনি। আবার দেখা হলে সেখানে কি একটু স্থান করে নেওয়া যায় না?

চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কী? ভাগ্য প্রসন্ন হলে সবই ত সম্ভব হয়।

রাজার মত ঐশ্বর্যের অধিকারিণী পোর্সিয়া! তাঁকে বিয়ে করবার প্রার্থনা নিয়ে আসছে দেশ-বিদেশের রাজা ও রাজপুত্রেরা। রাজার মত জাঁকজমক করেই তারা আসছে। কিন্তু ব্যাসানিওকে এখন পোর্সিয়ার কাছে যেতে হলে দীনহীন বেশেই যেতে হবে। তাঁর এখন চরম দৈন্য। না আছে উপযুক্ত সাজ-পোশাক, না আছে একটা চাকর। ব্যাসানিও

হিসাব করে দেখলেন—তিন হাজার ডুাকাট-এর কম খরচে বিয়ের চেষ্টা করা যাবে না। ডুাকাট মানে ভিনিসের মোহর।

তাই আজ ব্যাসানিও তিন হাজার ডুাকাট চাইতে এসেছেন বন্ধুর কাছে। অ্যাণ্টোনিও তাঁকে এই টাকাটা দিতে পারবেন এবং দেবেন এতে একটুও সন্দেহ, তাঁর নেই। সব কথা বন্ধুকে খুলেই বলেছেন। বরাত যদি ভাল হয়, পোর্সিয়াকে যদি তিনি বিয়ে করতে পারেন, তাঁর সকল অভাব ঘুচে যাবে এ আশার কথাও তিনি শুনিয়েছেন অ্যাণ্টোনিওকে।

সব শুনে অ্যাণ্টোনিও বললেন, "এ অতি চমৎকার সুযোগই এসেছে বটে। এ-চেষ্টা করতেই হবে। যদি সফল হও, তবে তো কথাই নেই! এক কথায় অফুরন্ত টাকাকড়ি লাভ হবে, স্ত্রীটিও হবে অতুলনীয়া। আর বরাত যদি মন্দই হয়, বিফল হয়ে ফিরতেই যদি হয়, তাতেও এমন বেশী কিছু ক্ষতি হবে না। মাত্র তিন হাজার ডুাকাট তো! নষ্ট হলে আমরা মারা যাব না।"

একটু থেমে অ্যাণ্টোনিও আবার বললেন, "যেতে তোমাকে হবেই। তবে আমার অসুবিধা একটু হয়েছে। টাকাকড়ি আমার হাতে নেই এই মুহূর্তে। সব জাহাজগুলি পাঠাতে হয়েছে দেশদেশান্তরে। শেষ ডুাকাটটিও খরচ হয়ে গেছে তাতে। অন্ততঃ একখানা জাহাজ যতক্ষণ ফিরে না আসছে, ততক্ষণ নগদ টাকার আমার খুবই অভাব; তোমার মতই আজ আমারও টাকার অভাব।"

ব্যাসানিও নিরাশ হয়ে বিষণ্ণমনে বসে রইলেন। অ্যাণ্টোনিও চিন্তা করলেন কিছুক্ষণ, তারপর বললেন, "কিন্তু জাহাজ ফিরে আসা পর্যন্ত তোমার পক্ষে বসে থাকা তো চলে না। তোমাকে অবিলম্বেই রওনা হতে হয়। তুমি তিন হাজার ডুাকাট অন্য কারও কাছে ধার কর।"

ব্যাসানিও বড় দুঃখে হেসে বললেন, "আর একটা অ্যাণ্টোনিও তো ভিনিস শহরে নেই! আমাকে ধার কে দেবে? বাজারে আমার কত দেনা তা কি জানো?"

অ্যাণ্টোনিও বাধা দিয়ে বলে উঠলেন, "যত দেনাই থাক, ধার পাবে না কেন? অবশ্যই পাবে। তুমি বলবে—আমি জামিন থাকব টাকার জন্য। আমি সই করে দেব দলিলে। কেন দেবে না লোকে? দুই মাসের ভিতর আমার সব জাহাজ ফিরবে। তুমি তিন মাসের কড়ারে তিন হাজার

ড্যাকাট ধার করার চেষ্টা কর। তাহলে আর কোন অসুবিধা হবে না আমার।"

* * *

অ্যাণ্টোনিওর জামিনে তিন হাজার কেন, ত্রিশ হাজার ড্যাকাটও ধার মেলা সম্ভব ছিল অন্য সময়ে। কিন্তু এসময়ে কানাকড়িও কেউ দিতে চাইল না। যে কারণে অ্যাণ্টোনিওর হাতে টাকাকড়ি নেই, ঠিক সেই কারণেই অন্য সব সওদাগরের হাতে এখন নগদ টাকার অভাব। দু'মাস পরে তাদের জাহাজ ফিরবে, তখন সবাই পারবে ধার দিতে। কিন্তু দু'মাস পরে হলে তো ব্যাসানিওর চলে না! তাঁর এখনি ধার চাই। কিন্তু টাকা তাঁকে দেবে কে? সারা ভিনিস শহর ঘুরেও তিনি ধারের যোগাড় করতে পারলেন না।

দৈবাৎ ব্যাসানিওর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল শাইলকের।

ভিনিসে অনেক ইহুদী বাস করে, টাকার কুমির তারা। তাদের একমাত্র কাজ হল চড়া সুদে টাকা ধার দেওয়া।

এই সুদখোর ইহুদীদের ভিতর আবার চরম সুদখোর হল শাইলক। তার দেনার কবলে পড়ে কত সওদাগর যে সব কিছু হারিয়ে পথে বসেছে, তার লেখাজোখা নেই। এজন্য সওদাগরেরা সবাই তাকে ঘৃণা করে। অ্যাণ্টোনিও তো তাকে দেখলেই 'কুত্তা' বলে গালি দেন, তার গায়ে থুথুও দেন সময়ে সময়ে। শাইলক মুখ বুজে সহ্য করে এসব। প্রতিবাদ করবার সাহস তার নেই।

মনে মনে সে অভিশাপ দেয় অ্যাণ্টোনিওকে, পারলে সে মাথা চিবিয়ে খায় তার। মনে মনে বলে—"যদি দিন পাই, এসব অপমানের শোধ তুলব।"

এ-হেন শাইলকের কাছে তিন হাজার ড্যাকাট ধার চাইলেন ব্যাসানিও, আর বললেন, "টাকাটা আমিই নেব বটে, কিন্তু জামিন থাকবেন অ্যাণ্টোনিও। ফেরত পেতে কোন অসুবিধা হবে না।"

অ্যাণ্টোনিওর নাম শুনে বিস্মিত হল শাইলক, মনে মনে খুশীও হল। মুখে বলল, "অ্যাণ্টোনিও জামিন হবেন? তাহলে তাঁর সঙ্গে তো আমার কথা হওয়া দরকার।"

এই সময়ে অ্যাণ্টোনিওকে দেখা গেল অদূরে। তিনি দুই একজন বন্ধুর সঙ্গে ঐদিকেই আসছেন। ব্যাসানিও ডাকলেন তাঁকে।

শাইলকের সঙ্গে ব্যাসানিওকে দেখেই ব্যাপারটা আগে থাকতেই বুঝে নিয়েছেন অ্যাণ্টোনিও। অন্য কারও কাছে ধার পাওয়া যাচ্ছে না, অথচ ব্যাসানিওর টাকা চাই-ই। এ-অবস্থায় শাইলক যদি টাকা দেয় আপত্তি কি?

অ্যাণ্টোনিও এসেই বললেন, "শুনেছ তো, শাইলক? আমরা তিন হাজার ড্যুকাট ধার চাই। শুনেছ?"

শাইলক গম্ভীর হয়ে বলল, "শুনেছি। শুনে অবধি কেবলই ভাবছি। ভাবছি যে দিনে দিনে হল কি? আমাকে যারা উঠতে বসতে কুত্তা বলে ডেকেছে, গায়ে থুথু দিয়েছে, তারা আজ টাকা ধার চাইছে আমার কাছে? আমি তো কুত্তা! কুত্তার কি টাকাকড়ি থাকে? কুত্তা কি পারে তিন হাজার ড্যুকাট ধার দিতে? ভাবছি—কালে কালে হল কি!"

কথার ভঙ্গি দেখে রেগে গেলেন অ্যাণ্টোনিও। রাগের সঙ্গেই তিনি বললেন, "কুত্তা ছাড়া আর কিছুই তুমি নও। ভেবো না যে টাকা ধার চাইছি বলে তোমায় আর কুত্তা বলব না, রাগ হলে আর গায়ে থুথু দেব না। ও আশা করে যদি ধার দাও, তবে ভুল করবে। আমাদের শত্রু বলেই মনে কোরো, এবং শত্রুতা করতে যাতে তোমার সুবিধা হয়, সেভাবেই ধার দিও। এখন কি বলতে চাও তুমি? দেবে কি ধার? তিন হাজার ড্যুকাট?"

শাইলক মনে মনে একটা অতি সাংঘাতিক মতলব এঁটে ফেলেছে এতক্ষণে। নরম সুরে অ্যাণ্টোনিওকে বলল, "রাগ কোরো না অ্যাণ্টোনিও, রাগ কোরো না। আমি আগেকার দিনের কথা বলছিলাম বই তো নয়! সেই অতীতের জের এখনও টেনে চলতে হবে, এমন কি কথা আছে? আমি তোমার বন্ধু হতেই চাই। তাই তিন হাজার ড্যুকাট ধার আমি তোমায় দেব, আর বিনা সুদেই দেব।"

"বিনা সুদে!"—অ্যাণ্টোনিও যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারেন না।

"নিশ্চয়ই! সুদের কোন কথাই লেখা হবে না দলিলে। তবে তাতে একটা হাসির কথা লেখা হবে। কিছুই নয়, সে-কথার আসলে কোন দাম নেই। আমার খেয়াল হয়েছে—তাই ঐ কথাটা লেখা থাকবে দলিলে। কথাটা এই যে—নির্দিষ্ট দিনে টাকা শোধ দিতে না পারলে অ্যাণ্টোনিওর বুকের পাশ থেকে এক পাউণ্ড মাংস আমি কেটে নিতে পারব! ব্যস! আর কিছুই না!"—বলল শাইলক।

"এক পাউণ্ড মাংস !" চমকে উঠলেন ব্যাসানিও, বললেন—"না না, এমন শর্তে টাকা ধার করব না !"

"করবে না ?"—যেন বড় দুঃখিত হয়েই শাইলক বলল, "ধার করবে না ? তাহলে কোরো না ! অত যেখানে সন্দেহ, সেখানে কোন কারবার না করাই ভাল। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি—দলিলে লেখা থাকলেই কি আমি সেই এক পাউণ্ড মাংস কেটে নিতে যাব ? কেটে নিয়ে কী করব ? ছাগলের মাংস খাওয়া যায়, মানুষের মাংস তো খাওয়া যায় না। আর বাজারে তা বিক্রিও হবে না। ও নিয়ে আমি করব কি ? তবে তোমাদের মনটা বুঝবার জন্যই আমি ওকথা পেড়েছিলাম, তা বুঝেও নিলাম। তোমরা যখন আমাকে অত সন্দেহ কর, তখন আমিই বা বিশ্বাস করে অত টাকা ধার দেব কেন তোমাদের ?"

অ্যাণ্টোনিও বোঝাতে লাগলেন ব্যাসানিওকে—"শাইলক অবশ্য খারাপ কোন মতলব করেই এ-প্রস্তাবটা তুলেছে। আমাকে বিপদে ফেলবার উপায় খুঁজছে সে। কিন্তু তার সুযোগ সে পাবে না। তিন মাসের কড়ারে আমরা ধার নেব। দুমাসের ভিতরেই আমার জাহাজ ফিরে আসবে। মেয়াদ পার হওয়ার ঢের আগেই আমরা শোধ করে দেব ওর ধারের টাকাটা।"

ইচ্ছা না থাকলেও বাধ্য হয়ে ব্যাসানিও রাজী হলেন। দলিল লেখা হল ঐ শর্তেই। তিন হাজার ডুকাট নিয়ে ব্যাসানিও বাড়ি ফিরলেন—বেলমণ্ট যাওয়ার ব্যবস্থা করবার জন্য।

সাজপোশাক, লোক-লশকর, যানবাহন, সব-কিছুই একে একে যোগাড় করে দু-এক দিনের ভিতরই ব্যাসানিও বেলমণ্ট রওনা হলেন ভাগ্যের পরীক্ষা করার জন্য। সঙ্গে গেলেন তাঁর বন্ধু গ্রাসিয়ানো।

* * *

পোর্সিয়ার বাবা ছিলেন খুবই বিচক্ষণ। তাঁর মৃত্যুর পর পোর্সিয়া যাতে নিজের খেয়ালমত বিয়ে করে একজন অপদার্থের হাতে না পড়েন, সেজন্য তিনি একটা অভিনব ব্যবস্থা করে গেছেন। তাঁর তিনটি বাক্সের মধ্যে একটিতে তিনি পোর্সিয়ার একখানি ছবি রেখে গেছেন। পোর্সিয়াকে বিয়ে করবার জন্য যে আসবে, তাকে নিয়ে যাওয়া হবে এই তিনটি বাক্সের কাছে—একটি সোনার, একটি রুপোর ও একটি সীসার। তাকে বেছে নিতে বলা হবে একটি বাক্স। যেটি সে বাছাই করে নেবে, সেটি খোলা

হবে তার সামনে। তার ভিতর যদি পোর্সিয়ার ছবি থাকে, তবেই পোর্সিয়া তাকে বিয়ে করতে পারবে।

একদিন এলেন মরক্কোর যুবরাজ। তাঁকে দেখানো হল ঐ তিনটি বাক্স। সোনার বাক্সের উপরে লেখা আছে—"আমায় বেছে নিলে তুমি তাই পাবে, যা বহুলোকেই চায়!" রুপোর বাক্সের উপর খোদাই করা আছে—"তোমার যতটুকু পাওয়ার যোগ্যতা আছে, আমায় বেছে নিলে তুমি ততটুকুই পাবে।" আর সীসার বাক্সের উপরকার লেখা এইরকম—"আমায় যে বেছে নেবে, তাকে প্রস্তুত থাকতে হবে নিজের সব কিছু দিয়ে দেবার জন্য।"

মরক্কোর যুবরাজ বিবেচনা করলেন—বহুলোকেই যা চায় তা হল সুন্দরী স্ত্রী। তিনিও তারই আশায় এদেশে এসেছেন—সুতরাং সোনার বাক্স বেছে নিলেই তিনি পোর্সিয়াকে পাবেন। তিনি বললেন—"সোনার বাক্সই আমি নিলাম।"

সোনার বাক্সটা খোলা হল। যুবরাজ চোখে আঁধার দেখলেন। পোর্সিয়ার ছবি তাতে নেই। একটুকরা কাগজে লেখা আছে—"যা কিছু চকচক করে, তাই সোনা নয়।"

দুচার দিন বাদে এলেন আরাগনের যুবরাজ। তিনি ভাবলেন—"যোগ্যতা? পোর্সিয়াকে পাওয়ার যোগ্যতা আমার নিশ্চয়ই আছে!" সুতরাং তিনি বাছাই করে নিলেন রুপোর বাক্স। তাঁকেও হতাশ হয়ে ফিরতে হল। পোর্সিয়ার ছবি তাতেও নেই।

অবশেষে এলেন ব্যাসানিও।

প্রথম দেখার পর কয়েক বছর কেটে গেলেও কোনদিনই পোর্সিয়া ব্যাসানিওকে ভোলেননি, তাই ব্যাসানিওকে দেখেই তিনি চিনলেন।

সেই বহুদিন আগে ব্যাসানিও তাঁর অন্তরে যে জায়গাটুকু দখল করে নিয়েছিলেন, তা এখনো ব্যাসানিওর দখলে রয়েছে। একদিন যাঁকে পছন্দ করেছিলেন, দেখা হয়নি বলেই তাঁকে ভুলে যাওয়ার মত নারী পোর্সিয়া নন।

কিন্তু তাঁর নিজের পছন্দ-অপছন্দের কোন দামই নেই বিয়ের ব্যাপারে। পিতা তাঁকে দিয়ে এ বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে বেঁধে রেখে গেছেন একটি শর্তে।

দুরুদুরু বুকে তিনি ব্যাসানিওকে নিয়ে গেলেন বাক্স তিনটির কাছে।

ব্যাসানিও পড়লেন, "বহুলোকে যা চায়, তাই পাবে"—বলছে সোনার বাক্স।

লোকের চাওয়া কি সব সময়ে ঠিক হয়? যা চাই, তা ভাল নাও হতে পারে।

"নিজের যতটুকু যোগ্যতা ততটুকুই পাবে"—বলছে রুপোর বাক্স।

যোগ্যতা? আমার কি যোগ্যতা আছে? ব্যাসানিও মনে মনে বলেন—"আমি পোর্সিয়ার একান্তই অযোগ্য।"

"নিজেকে সব কিছু দান করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে"—বলছে সীসার বাক্স।

ভালবাসার পাত্রীকে সবকিছু দান করতে যে পারে না, সে কিসের জোরে তাকে পাওয়ার আশা করে? ব্যাসানিওর তো আর কিছু নেই, তিনি শুধু নিজেকেই দান করতে পারেন পোর্সিয়াকে।

ব্যাসানিও তাই সীসার বাক্স খুললেন, আর দেখলেন—পোর্সিয়ার ছবি সেই বাক্সেই রয়েছে।

আনন্দ-কোলাহলে ভরে গেল বেলমণ্টের প্রাসাদ। পোর্সিয়া যাঁকে চেয়েছিলেন, দৈববশে তাঁকেই লাভ করেছেন পতিরূপে। পোর্সিয়ার মনের কথা জানত তাঁর সহচরী নেরিসা। সে আবার বেজায় রসিকা। সে-ই ইশারায় জানিয়ে দিল সবাইকে।

মহোৎসবে মেতে উঠল বেলমণ্ট। বিয়ের আয়োজন হতে লাগল এমন সমারোহের সঙ্গে, যা দেশের লোক চোখে দেখেনি কোনদিন।

ঠিক এসময়ে বিনা মেঘে বাজ পড়ল যেন! ভিনিস থেকে একটা চিঠি এল ব্যাসানিওর নামে। তিন মাস পার হয়ে গেছে। এর মধ্যে অ্যান্টোনিওর একখানি জাহাজও ফেরেনি বলে তিনি ধার শোধ দিতে পারেননি। শাইলক আদালতে নালিশ করেছে অ্যান্টোনিওর নামে। অ্যান্টোনিও এখন কারাগারে আছেন।

সব আনন্দ উবে গেল বেলমণ্ট প্রাসাদ থেকে। ব্যাসানিও শোকে দুঃখে একেবারে ভেঙে পড়লেন। সব কথা তিনি খুলে বললেন পোর্সিয়াকে। যে-বন্ধুর সাহায্যে তিনি পোর্সিয়ার কাছে আসতে পেরেছেন, সে-বন্ধুর প্রাণ যেতে বসেছে আজ। অনুতাপে জ্বলে যাচ্ছেন ব্যাসানিও। পোর্সিয়ার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হতে যাচ্ছে, এ সৌভাগ্যও আজ তাঁর কাছে যেন কিছুই নয়!

পোর্সিয়া বললেন—"আমার টাকাকড়ি সব এখন থেকে তোমারই।

যত ইচ্ছা টাকাকড়ি নিয়ে এখনই তুমি ভিনিসে যাও। তিন হাজারের জায়গায় দশ বিশ হাজার—যত চায় তত টাকাপয়সা দাও সেই শাইলককে। যে-কোনরকমে খালাস করে আনো তোমার বন্ধু অ্যাণ্টোনিওকে।"

সমারোহ বাদ দিয়ে অতি সাধারণভাবে তাড়াতাড়ি পোর্সিয়ার সঙ্গে ব্যাসানিওর বিয়ে হয়ে গেল। সেই একই সময় ব্যাসানিওর বন্ধু গ্রাসিয়ানোরও বিয়ে হয়ে গেল পোর্সিয়ার সহচরী নেরিসার সাথে।

তারপর ব্যাসানিও আর গ্রাসিয়ানো রওনা হয়ে গেলেন ভিনিসের দিকে।

পোর্সিয়াও নেরিসাকে নিয়ে চলে গেলেন পডুয়া শহরে। সেখানে তাঁর এক আত্মীয় আছেন। তিনি এদেশের সব চেয়ে নামজাদা উকিল।

* * *

ভিনিসের আদালতে আজ আর মানুষ ধরে না। সারা শহরের লোক যাঁকে ভালবাসে সেই অ্যাণ্টোনিওর জীবন আজ যেতে বসেছে—ঘৃণিত শাইলকের চক্রান্তে। ধারের এমন সর্বনাশা শর্তের কথা কেউ কোনদিন শুনেছে? ধারের টাকা সময়মত ফেরত দিতে না পারলে বুকের মাংস কেটে নেবে? শহরসুদ্ধ লোক অভিসম্পাত করছে শাইলককে।

কিন্তু অভিসম্পাতে কী যায় আসে? দেশের আইন যা বলে, তাই তো হবে। দলিলে যে-শর্তের কথা লেখা আছে, তা কেউ বাতিল করতেই পারে না।

বিচার করতে বসেছেন স্বয়ং ডিউক—ভিনিসের শাসক। তিনি শুধু চেষ্টা করছেন—শাইলক যাতে দয়া করে এই শর্তটা ছেড়ে দেয়।

ডিউক বললেন, "শোন শাইলক, আইন তোমার দিকে। কিন্তু দয়া তোমায় করতেই হবে। অ্যাণ্টোনিওর মৃত্যুই হোক, এমন মতলব কখনো তোমার হতে পারে না।"

শাইলকের কানে কোন কথাই প্রবেশ করে না। কানে তার একটি কথাই যেন একনাগাড়ে বেজে চলেছে। বহুদিন আগের শোনা একটি কথা—"কুত্তা! কুত্তা!" সেই কুত্তা আজ দাঁত বার করেছে। কামড়াবে সে! সেই কামড়ে যদি অ্যাণ্টোনিওর মৃত্যু হয় তো শাইলক কি করবে?

যে যা বলছে, দাঁতমুখ খিঁচিয়ে সে কেবলই জবাব দিচ্ছে—"দয়ার কথা ওঠে কেন? আইনে যা আছে, তাই হবে। তিন মাসের ভিতর ধারের টাকা আমি ফেরত পাইনি বলে অ্যাণ্টোনিওর এক পাউণ্ড মাংস আমার পাবার কথা। সেটা আইন কি আমায় দেবে না?"

ডিউককে স্বীকার করতে হল—আইন তা দিতে বাধ্য। কিন্তু মাংস নিয়ে শাইলকের কী লাভটা হবে ? ব্যাসানিও ধারের টাকার নগুণ টাকা এখনই দিতে রাজী। তাই নিয়ে শাইলক অ্যান্টোনিওকে রেহাই দিক্।

ব্যাসানিও বারবার বলছেন—"এই যে, টাকা নিয়ে আমি বসে আছি।"

কিন্তু কে নেবে টাকা ? শাইলক টাকা নেবে না। নেবে অ্যান্টোনিওর বুকের পাশ থেকে এক পাউণ্ড মাংস। লম্বা ছোরা বার করে সে পাথরের মেঝেতে শান দিচ্ছে।

এমন সময় একজন তরুণ উকিল তাঁর মুহুরীকে নিয়ে আদালতে প্রবেশ করলেন। পত্নয়ার সবচেয়ে নামাজাদা উকিল বেলারিওর কাছ থেকে চিঠি নিয়ে এসেছেন এই তরুণ।

বেলারিওকে এই মামলা চালাবার জন্য ডিউক এর আগে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। বেলারিও অসুস্থ বলে আসতে পারেননি। তাই তিনি পাঠিয়েছেন তাঁর এক সহকারী উকিলকে।

উকিলের সুন্দর চেহারা, চটপটে কথাবার্তা। ডিউকের মনে একটা রেখাপাত করল অবশ্য। কিন্তু এ-মামলায় করবার কী আছে, তা তিনি বুঝতে পারলেন না। তবু বেলারিওর খাতিরে তিনি এই তরুণ উকিলকে মামলা চালাবার অনুমতি দিলেন।

উকিল বললেন, "দলিলটা আমি একবার দেখতে পারি কি ?"

শাইলক তাঁকে দলিল দিল।

তিনি সেখানা পড়ে দেখে ধীরভাবে বললেন, "বেশ পরিষ্কার দলিল। কোন গোলমাল নেই। তিন হাজার ড্যুকাট ধার করেছেন অ্যান্টোনিও। তিন মাসের ভিতর শোধ দেওয়ার কথা আছে। ওই সময়ের মধ্যে ধার শোধ না করলে শর্ত আছে যে শাইলক এক পাউণ্ড মাংস অ্যান্টোনিওর বুক থেকে কেটে নিতে পারবেন।"

শাইলক ঘন ঘন মাথা নেড়ে বলতে লাগল—"ঠিক ! ঠিক !"

উকিল আবার বললেন, "দলিলে কোনই গোলমাল নেই। অ্যান্টোনিওর দিক থেকে বলবারও কিছু নেই। আইনতঃ তাঁর এক পাউণ্ড মাংস শাইলকের পাওনা। শাইলক অবশ্যই তাঁর পাওনা মিটিয়ে পাবেন।"

শাইলক আনন্দে চেঁচিয়ে বলল, "দানিয়েল ! দানিয়েল ! এ আদালতে আজ দানিয়েল এসেছেন।"

দানিয়েল ছিলেন প্রাচীন যুগের এক ন্যায়বিচারক। তাঁর জ্ঞান ছিল অসাধারণ, আর তিনি বিচারে কখনও অন্যায় করতেন না।

কিন্তু এরপর উকিল যা বললেন, তা শাইলকের মোটেই পছন্দ হল না। তিনি বললেন, "এ-অবস্থায় আমাদের করবার জিনিস শুধু একটিই আছে, সে হল শাইলকের কাছে দয়া ভিক্ষা করা।"

সবাইয়ের মুখে সেই একই কথা। শাইলক বিরক্ত হয়ে বলল, "দয়া? দয়া কেন করব? দলিলে কি দয়ার কথা লেখা আছে?"

উকিল উত্তর দিলেন, "দয়া কোন কথা বা শর্তের ধার ধারে না। দয়া মহতের অন্তর থেকে আপনিই ঝরে পড়ে অভাগার উপরে। যে দয়া পায়, সে তো ধন্য হয়ই; দয়া যে করে, সেও ধন্য হয়। ধন্য হবার এমন সুযোগ পেয়ে একটুও দয়া কি তুমি দেখাবে না শাইলক?"

শাইলক চেঁচিয়ে বলল, "না না না। আমি দয়া করব না। আমি আমার পাওনা গণ্ডা সব বুঝে নেব। যদি তা থেকে আমাকে বঞ্চিত করাই তোমাদের ইচ্ছা হয়, তবে স্পষ্ট বলে দাও, আমি বাড়ি চলে যাই।"

তখন উকিল বললেন, "তাহলে আর কি হবে। অ্যান্টোনিও! আপনি তৈরী হোন। শাইলক আপনার বুক থেকে এক পাউণ্ড মাংস কেটে নিক্! ভাল কথা—শাইলক, এখানে একজন চিকিৎসক এনে রেখেছ তো? এক পাউণ্ড মাংস কেটে নিলে—"

উকিলকে বাধা দিয়ে সে বলল, "দলিলে কি চিকিৎসকের কথা লেখা আছে? দলিলে যা লেখা নেই, তা কোনমতেই হতে পারবে না।"

হতাশার সুরে উকিল বললেন, "তাহলে আর কি হবে! নাও শাইলক, অ্যান্টোনিওর এক পাউণ্ড মাংস কেটেই নাও। কিন্তু দেখো, এক পাউণ্ডের এক তিল বেশী কেটো না, বা এক তিল কম কেটো না। ঠিক এক পাউণ্ড মাংসই তোমায় কেটে নিতে হবে, আর এক ফোঁটাও রক্ত যেন তার সঙ্গে না পড়ে। রক্তের কথা দলিলে তো লেখা নেই, কোনমতেই রক্তপাত তুমি করতে পারবে না।"

একটি মুহূর্ত! আদালত নীরব। এ কী নতুন কথা! কথাটির মানে বুঝতেই একটু সময় লাগল সকলের।

তারপর হঠাৎ এক তুমুল জয়ধ্বনিতে আদালত যেন ভেঙে পড়ল। বহু লোক চেঁচিয়ে উঠল—"দানিয়েল! দানিয়েল! দেখছ কি শাইলক, স্বয়ং দানিয়েল এসেছেন বিচার করতে!"

শাইলকের পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেল যেন! সে বিবর্ণ হয়ে বলল, "তাহলে থাক্, মাংস আমার চাই না! আমায় নগুণ টাকা দিতে চেয়েছিল ব্যাসানিও, তাই আমি নেব।"

"এই যে টাকা! এই নাও শাইলক!"—বলে লাফিয়ে উঠলেন ব্যাসানিও।

তাঁকে থামিয়ে দিয়ে উকিল শাইলককে বললেন, "না, না, নগুণ তো দূরের কথা ঐ তিনহাজার ডুাকাটও তুমি পাবে না। পার যদি, রক্ত বাদ দিয়ে মাংস কেটে নাও। তা যদি না পার, টাকা তুমি পাবে না। বরং তুমি অ্যান্টোনিওর প্রাণ নেবার জন্য একটা জঘন্য ফন্দি করেছিলে—এ-রকম অপরাধে ভিনিসের আইন অনুসারে তোমার প্রাণদণ্ড হবে। তাছাড়া তোমার সমস্ত সম্পত্তি থেকেও বঞ্চিত হবে তুমি। তোমার সম্পত্তির অর্ধেক পাবেন অ্যান্টোনিও, অর্ধেক ভিনিসের সরকারে বাজেয়াপ্ত হবে।"

ডিউক বললেন, "ইহুদী আর খ্রীস্টানে যে কত তফাত, তা বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য আমি তোমার প্রাণদণ্ড মকুব করছি।"

অ্যান্টোনিও বললেন, "আর আইনের ব্যবস্থা অনুসারে তোমার সম্পত্তির যে-অংশ আমার পাওনা, তা আমি তোমায় ফেরত দিচ্ছি এই শর্তে যে তা তুমি তোমার মেয়ে জামাইকে দান করবে।"

ডিউকের দিকে মুখ ফিরিয়ে অ্যান্টোনিও বললেন, "ওর মেয়ে জেসিকো ওর অমতে লরেঞ্জো নামে এক খ্রীস্টান যুবককে বিয়ে করেছে বলে ও তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে।"

শাইলক তখন পালাতে পারলে বাঁচে। সকল শর্তে রাজী হয়ে সে আদালত থেকে বেরিয়ে গেল।

তখন তরুণ উকিলকে ঘিরে সবাই তাঁকে প্রশংসা করতে লাগলেন। এই অল্প বয়সে এমন গভীর আইনজ্ঞান, এবং এমন আশ্চর্য উপস্থিত-বুদ্ধি আর কারও যে কোনদিন দেখা যায়নি—সবাই একবাক্যে সে-কথা বলতে লাগলেন।

ব্যাসানিও তাঁকে অনুরোধ করলেন উপযুক্ত পারিশ্রমিক নেবার জন্য। কিন্তু উকিল বললেন, "আমরা বিপন্নের উপকার করে টাকাপয়সা নেই না।" তারপর বেধে গেল ব্যাসানিওতে আর উকিলে কথার তুবড়িবাজি। ব্যাসানিও কিছু না দিয়ে ছাড়বেন না, উকিলও কিছুই নেবেন না। শেষ পর্যন্ত উকিল বললেন, "বেশ, আমি কিছু না নিলে আপনি যদি খুবই

দুঃখিত হন, তাহলে এক কাজ করুন, আপনার হাতের ঐ আংটিটা আমায় উপহার দিন।"

আংটি! ব্যাসানিও তিন হাত পিছিয়ে এলেন। এ-আংটি তিনি দেবেন কি করে? এ যে বিয়ের আংটি! পোর্সিয়া যে সবে সেদিন বিয়ের সময় তাঁকে এ আংটি উপহার দিয়ে বারবার বলেছেন, "দেখো, জীবনে কোনদিন এ আংটি অপর কাউকে দিও না!"

ব্যাসানিও তাঁর উকিলকে বললেন, "এ-আংটির বদলে অন্য মহা-মূল্য আংটি আমি আপনাকে কিনে দিচ্ছি। একটু অপেক্ষা করুন আপনি।"

উকিল ভয়ানক দুঃখ পেলেন যেন! বললেন, "আংটি আমার অনেক আছে। কিছু না নিলে আপনি দুঃখ পাবেন মনে করেই আমি ঐ আংটিটা চেয়েছিলাম। তা থাক্, আংটি দিতে হবে না আপনাকে। ভিখারীকে কিভাবে হাঁকিয়ে দিতে হয়, তা আপনার কাছে শেখা গেল মশাই।"

চলে গেলেন উকিল তাঁর মুহুরীকে নিয়ে।

অ্যাণ্টোনিও দেখলেন ব্যাপারটা ভয়ানক অন্যায় হল। তিনি ব্যাসা-নিওকে বললেন, "তোমার স্ত্রীকে আমি বুঝিয়ে বলব ভাই! সব কথা শুনলে তিনি তোমার উপর রাগ করতে পারবেন না। তুমি এখন তোমার আংটি পাঠিয়ে দাও ওঁকে। উপকারী লোককে দুঃখ দিতে নেই।"

ব্যাসানিও আর কি করেন, গ্রাসিয়ানোর হাত দিয়ে আংটি উকিলের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। উকিল তখন বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছেন, গ্রাসিয়ানোকে ছুটতে হল রীতিমত।

ছুটে গিয়ে গ্রাসিয়ানো বেচারাও পড়ে গেল বিপদে। তার নিজের হাতেও একটা আংটি ছিল। বিয়ের দিন নতুন বউ নেরিসা তার হাতে সেই আংটি পরিয়ে দিয়েছিল। এখন উকিলের মুহুরী ছোকরা সেই আংটিটা বকশিশ চেয়ে বলল, "তোমার মনিব যখন আমার মনিবকে তাঁর নিজের হাতের আংটি উপহার দিচ্ছেন, তখন তোমারও উচিত আমাকে তোমার হাতের আংটিটা উপহার দেওয়া।"

অগত্যা গ্রাসিয়ানোকেও নিজের আংটিটা দিয়ে আসতে হল। মনকে সে সাহস দিল এই বলে—"ব্যাসানিও যখন আংটি দিতে পেরেছেন, তখন আমি দিলে আর বেশী কি দোষ হবে?"

* * *

বেলমণ্টে আজ আবার মহোৎসব।

অ্যাণ্টোনিওকে খালাস করে নিয়ে ব্যাসানিও সদলে ফিরে এসেছেন। হাস্যমুখী পোর্সিয়া সাদরে স্বামীকে আর তার প্রিয় বন্ধুকে অভ্যর্থনা করলেন। খাওয়া-দাওয়া, নাচ-গান, আমোদ-আহ্লাদে প্রাসাদ আনন্দ-মুখর হয়ে উঠল।

উৎসবের মাঝে একসময় একটা ঝগড়ার রেশ শোনা গেল যেন! নেরিসার গলার আওয়াজ! পোর্সিয়া ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কী হল রে নেরিসা? আজকের শুভদিনে ঝগড়া কিসের?"

নেরিসা বলল, "দেখুন দেখি, কি অন্যায়! বিয়ের দিন স্বামীর হাতে আমি একটা আংটি পরিয়ে দিয়েছিলাম; তা তিনি সেটা কাকে বিলিয়ে দিয়ে এসেছেন।"

পোর্সিয়া গম্ভীর হয়ে বললেন, "বড় খারাপ কথা গ্রাসিয়ানো! বিয়ের আংটি কাউকে দিয়ে দিতে আছে? ছিঃ! ছিঃ! আমিও আমার স্বামীকে একটা আংটি দিয়েছিলাম। আমি নিশ্চয় জানি, কোন কারণেই তিনি তা অন্য কাউকে দেবেন না।"

গ্রাসিয়ানো বাঁচলো যেন? সে চেঁচিয়ে বলে উঠল, "উনিই তো আগে নিজের আংটিটা দিলেন! ওঁর দেখাদেখিই না আমি—"

পোর্সিয়া চমকে চাইলেন ব্যাসানিওর দিকে।

ব্যাসানিও লজ্জিত হয়ে বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে নিরুপায় অবস্থায় পড়ে তিনি পোর্সিয়ার দেওয়া আংটিটা উকিলকে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। ওটা না দিলে অমন উপকারী উকিল ভদ্রলোকটি নিরাশ হয়ে ফিরে চলে যাচ্ছিলেন।

পোর্সিয়া কোন কথাই কানে তুলতে চান না। ভয়ানক রাগ করতে লাগলেন তিনি। তখন এ্যাণ্টোনিও এসে বন্ধুর হয়ে ক্ষমা চাইলেন তাঁর কাছে, বললেন—"আমার জন্যই এটা হয়ে গেছে, আমার মুখ চেয়ে আপনার স্বামীর অপরাধ ভুলে যান।"

পোর্সিয়া তখন নরম হয়ে বললেন, "আপনার অনুরোধ ঠেলে ফেলতে পারি না। কিন্তু আপনার বন্ধু যেন আর কখনো এ-রকম না করেন। আমি আর একটা আংটি দিচ্ছি তাঁকে। এটা যেন আবার কাউকে বিলিয়ে না দেন।"

নতুন আংটি হাতে পেয়ে ব্যাসানিও চমকে উঠলেন। আরে, এ তো

সেই বিয়ের আংটিটাই! উকিলের হাত থেকে পোর্সিয়ার কাছে এল কী করে?

এদিকে নেরিসাও গ্রাসিয়ানোকে দিয়ে ছিল তার আংটি। গ্রাসিয়ানোও চমকে উঠল তা দেখে। সেটাও তারই বিয়ের আংটি!

তখন সব রহস্য পরিষ্কার হয়ে গেল। সেই প্রতিভাধর তরুণ উকিল আর কেউ নয়—পুরুষবেশী পোর্সিয়া।

আর সেই মুহুরী ছোকরা? সেও নেরিসা ছাড়া আর কেউই নয়।

পোর্সিয়াই বুদ্ধিবলে প্রাণ বাঁচিয়েছেন অ্যাণ্টোনিওর।

ব্যাসানিও নিজের ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিলেন। অ্যাণ্টোনিওর মত বন্ধু, আর পোর্সিয়ার মত স্ত্রী যাঁর আছে, তাঁর মত সুখী কে?

———



সিম্বেলিন

আজ থেকে দু হাজার বছরেরও আগের কথা। ইংলণ্ড তখন কয়েকটি ছোট বড় রাজ্যে বিভক্ত। দক্ষিণ অঞ্চলের সাগরতীরের বড় রাজ্যটির নাম ব্রিটেন।

এ সময় ইওরোপের প্রায় সব দেশই রোমান সাম্রাজ্যের অধিকারে, এমন কি সুদূর ব্রিটেনেও রোমানদের যাতায়াত শুরু হয়েছে। রোমান সেনাপতি জুলিয়াস সীজারের কাছে যুদ্ধে হেরে গিয়ে ব্রিটনরাজ কেসিবেলান রোমে রাজকর পাঠিয়ে রোমের আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছেন।

এর আরও কয়েক বছর বাদে জুলিয়াস সীজারের মৃত্যু হলে রোমানরা ঘরোয়া বিবাদে দুর্বল হয়ে পড়ল। এই সুযোগে ব্রিটনরাজ সিম্বেলিন রোমানদের রাজকর দেওয়া বন্ধ করলেন। সিম্বেলিন ছিলেন ব্রিটনরাজ কেসিবেলানের ভাইপো।

ব্রিটনরাজ সিম্বেলিনের এক অনুগত ও বিশ্বস্ত সেনাপতি ছিলেন। তাঁর নাম বেলারিয়াস। নানা যুদ্ধে বীরত্বের পরিচয় দিয়ে তিনি রাজার প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর সৌভাগ্য দেখে কয়েকজন হিংসুক সভাসদ্ বেলারিয়াসের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত তারা রাজার কাছে বেলারিয়াসের নামে একটা মিথ্যা অভিযোগ পেশ করল এবং জাল প্রমাণও দাখিল করল। এতে রাজা মনে করলেন যে বেলারিয়াস তাঁকে সিংহাসন থেকে তাড়িয়ে দেবার জন্য রোমানদের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ

করছেন। বেলারিয়াসকে অপরাধী বলে স্থির করে সিম্‌বেলিন দেশ থেকে তাড়িয়ে দিলেন তাঁকে, আর তাঁর জমিদারি, কেল্লা ও টাকাকড়ি রাজসরকারে বাজেয়াপ্ত করলেন। নিরপরাধ বেলারিয়াস রাতারাতি সবকিছু হারিয়ে ভিখারীর বেশে পথে বেরিয়ে পড়লেন অজানা আশ্রয়ের খোঁজে, আর মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন যে রাজার এই অবিচারের তিনি চরম প্রতিশোধ নেবেন।

ব্রিটনরাজ সিম্‌বেলিন আর তাঁর কোন খোঁজ রাখলেন না। সকলেই জানল যে তিনি দেশ ছেড়ে চলে গেছেন। বেলারিয়াস কিন্তু দেশ ছেড়ে যাননি, বাস করছেন ওয়েল্‌সের জঙ্গলে অচেনা নামে, আর প্রতিহিংসার আগুন বুকে নিয়ে।

সিম্‌বেলিনের দুটি ছেলে ছিল। একটির বয়স তিন, অপরটির এক। তাদের নাম গিডেরিয়াস ও আরভিরেগাস। তাদের এক ধাই-মা ছিল, নাম তার ইউরিফাইল।

ইউরিফাইলকে নানা লোভ দেখিয়ে নিজের বশে আনলেন বেলারিয়াস। তার পরামর্শে সেই ধাই-মা চুরি করল রাজা সিম্‌বেলিনের দুই অবোধ ছেলেকে। চুরি করে সে নিয়ে গেল ওয়েল্‌সের জঙ্গলে বেলারিয়াসের কাছে। তারপর বেলারিয়াস ইউরিফাইলকে বিয়ে করলেন ও তারা রাজপুত্র দুজনকে মানুষ করতে লাগলেন ওয়েল্‌সের পাহাড় ও জঙ্গলে। ওদের নতুন নাম দেওয়া হল পলিডোর ও কডওয়াল।

রাজা সিম্‌বেলিন তাঁর হারানো ছেলে দুটির অনেক খোঁজ করেছিলেন কিন্তু সফল হন নি। এদিকে তাঁর এক মেয়ে হল। মেয়েটির নাম রাখা হল আইমোজেন। মেয়ের জন্মের কিছুদিন বাদে রানী মারা গেলেন।

* * *

দেখতে দেখতে বহু বৎসর কেটে গেছে। ওয়েল্‌সের জঙ্গলে সেই দুজন রাজপুত্র এখন হয়ে উঠেছে যুবক। তাদের ধাই-মা ইউরিফাইল আর এখন বেঁচে নেই। বেলারিয়াস অবশ্য এখনো জীবিত। তাঁকে ছেলেরা জানে মর্গান নামে, নিজের বাবা মনে করে দেবতার মত ভক্তি করে তাঁকে। তিনিও নিজের ছেলের মতই স্নেহ করেন তাদের। তারা যে রাজপুত্র— সে পরিচয় গোপন রেখেও যত্ন করে তাদের এমন শিক্ষা দিয়েছেন, যাতে রাজ্যলাভ করলে তারা আদর্শ রাজাই হতে পারে।

রাজকন্যা আইমোজেনও এখন একজন যুবতী। রূপে গুণে সে

অতুলনীয়া, ধর্মে তার প্রবল অনুরাগ। তার নম্র ব্যবহারে ও মিষ্ট স্বভাবের আকর্ষণে সকলেই মুগ্ধ। মানমর্যাদাবোধ তার খুবই প্রখর। ব্রিটেনের সিংহাসন সে-ই পাবে একদিন।

এদিকে রাজা সিম্‌বেলিন বুড়ো বয়সে আবার বিয়ে করে বসলেন। যাঁকে বিয়ে করলেন, তিনি হচ্ছেন এক বিধবা মহিলা। তাঁর আগের পক্ষের একটি ছেলে আছে—নাম ক্লোটেন, বয়সে তরুণ। তাকে সকলে রানী-মার ছেলে বলেই চেনে। ক্লোটেন হচ্ছে এক বিবেকহীন লোভী যুবক। সংসারে যত-রকম অসৎ কাজ আছে, সবেতেই সে এরই মধ্যে হাত পাকিয়েছে। কোন রকম পাপের ভয়ে সে পিছিয়ে যায় না।

বুড়ো রাজাকে বিয়ে করার একটা উদ্দেশ্য ছিল রানীর। তাঁর ইচ্ছা,—তাঁর আগের পক্ষের ছেলে ক্লোটেনের সঙ্গে আইমোজেনের বিয়ে দিয়ে ক্লোটেনকে তিনি ব্রিটেনের সিংহাসনে বসাবেন।

মিষ্ট ব্যবহারে আইমোজেনকে নতুন রানী বশ করবার চেষ্টা করেন। আর ওদিকে গোপনে তার বিরুদ্ধে রাজার কাছে এমন কায়দা করে মিথ্যা অভিযোগ করেন যে রাজা মেয়ের উপরে বিরক্ত হন, আর মনে করেন যে তাঁর নতুন রানীর ভয়ানক স্নেহ আছে মেয়ের উপরে। আবার রাজা যখন মেয়েকে বকাবকি করেন, তখন অন্তরে বিষ থাকলেও মুখে মধু মাখিয়ে তাকে মিষ্ট কথায় সান্ত্বনা দেন রানী, যাতে বিমাতার উপর আইমোজেনের ভক্তি আর বিশ্বাস দিন দিন বেড়ে ওঠে।

কিন্তু তবু আইমোজেনের দারুণ বিরাগ রানী ও তাঁর ছেলে ক্লোটেনের উপর। ক্লোটেন যে অতি খারাপ লোক, তা আইমোজেন অতি অল্পদিনের মধ্যেই বুঝতে পেরেছে। তাকে এখন রীতিমত ঘৃণা করে আইমোজেন, আর তারই মা বলে রানীকেও সে অবিশ্বাস করে। রানীর আগ্রহে রাজাও এখন চাইছেন যে ক্লোটেনের সাথেই আইমোজেনের বিয়ে হোক। কিন্তু আইমোজেন স্পষ্টই বাবাকে জানিয়ে দিয়েছে যে সে কোনমতেই ক্লোটেনকে বিয়ে করবে না। এতে রানী তো বটেই, রাজাও বিরক্ত হয়েছেন আইমোজেনের উপর। কিন্তু আশা ছাড়েননি তাঁরা; ক্লোটেনকে বলেছেন ধৈর্য ধরে আইমোজেনকে খুশী করতে।

রাজা সিম্‌বেলিনের সভায় ছিল একজন সাহসী বীর যুবক—তার নাম পোস্‌থুমাস লেওনেটাস। এই যুবকের বাবা ছিলেন সিম্‌বেলিনের সেনাপতি।

অনেকদিন আগে এক যুদ্ধে পোস্‌থুমাসের বাবার মৃত্যু হলে তাঁর মা-হারা ছেলেটিকে সিম্‌বেলিন নিজের কাছে রেখে সযত্নে লালনপালন করেন। বয়স বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটিও বাপের সকল সদ্‌গুণের অধিকারী হয়ে উঠল। যেমন সে মহৎ, তেমনি সে বীর ও দেশপ্রেমিক; এই পোস্‌থুমাস অনুরাগী হল আইমোজেনের প্রতি এবং আইমোজেনও বীর যুবক পোস্‌থুমাসের অনুরাগ দূরে ঠেলে ফেলতে পারল না। গোপনে আইমোজেন বিয়ে করল পোস্‌থুমাসকে।

শীঘ্রই জানাজানি হয়ে গেল এই বিয়ের কথা। রাজা রেগে গিয়ে পোস্‌থুমাসকে রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দিলেন। পোস্‌থুমাস চোখের জল ফেলে বিদায় নিল আইমোজেনের কাছ থেকে। যাওয়ার সময় তার স্বর্গীয়া মায়ের দেওয়া একটি কঙ্কণ উপহার দিয়ে গেল আইমোজেনকে, আর বলল, "দেখো, এই কঙ্কণটি যেন না হারায়। এতে আমার মায়ের হাতের ছোঁয়া মাখানো আছে। এ হারালে ভয়ানক অমঙ্গল হবে।" আইমোজেনও তার হাতের আংটি খুলে নিজে স্বামীকে পরিয়ে দিল।

আইমোজেনের বিয়ে হয়ে গেছে শুনে ক্লোটেন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। তার বড় আশা ছিল যে সে আইমোজেনকে বিয়ে করে একদিন ব্রিটেনের সিংহাসনে রাজা হয়ে বসবে। এখন তার সে আশায় ছাই পড়ল। তার মাও ভয়ংকর ক্রুদ্ধ হয়ে ফন্দী আঁটতে লাগলেন কি ভাবে ক্লোটেনকে রাজার মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসানো যায়। অনেক ভেবেচিন্তে রানী ঠিক করলেন যে আইমোজেনকে হয় এই গোপন বিয়েটা অস্বীকার করে তাঁর ছেলে ক্লোটেনকে বিয়ে করতে হবে, নয়তো আইমোজেনকে এই দুনিয়া থেকে সরে যেতে হবে। আইমোজনকে যাতে গোপনে এবং কারও সন্দেহ না রেখে হত্যা করা যায়, তার জন্য তিনি বিষ যোগাড় করলেন রাজবাড়ির ডাক্তার কর্নেলিয়াসের কাছে। অবশ্য কর্নেলিয়াসকে তিনি ঘুণাক্ষরেও জানালেন না তাঁর আসল মতলবের কথা। আর কর্নেলিয়াসও রানীকে বিশ্বাস করতেন না মোটেই। তাই তিনি আসল বিষ তুলে দেননি রানীর হাতে।

ওদিকে রাজাও আইমোজেনের বিয়েটা মোটেই পছন্দ করেননি। রানীর মতোই চেয়েছিলেন ক্লোটেনের সাথে আইমোজেনের বিয়ে দিতে। তাই রানীর পরামর্শে তিনিও এখন চান—আইমোজেন তার গোপন বিয়েটা সরাসরি অস্বীকার করুক। কিন্তু আইমোজেন বাবার একথায়

মোটেই কান দিল না। সে পোস্‌থুমাসকে ভালবেসে বিয়ে করেছে, আর এখন তার স্বামীর জন্য যে-কোন স্বার্থ হাসিমুখে ত্যাগ করতে রাজী।

ওদিকে ক্লোটেনকে শান্ত করার জন্য রাজা ও রানী কেবলই তাকে পরামর্শ দিচ্ছেন—ধৈর্য ধরে আইমোজেনের সঙ্গে মেলামেশা করে তার মনের পরিবর্তন সে নিয়ে আসুক। তাহলে ধীরে ধীরে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। পোস্‌থুমাস তো আর কোনদিনই দেশে ফিরে আসতে পারবে না, তাই তার দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে আইমোজেনের মনের রঙ পালটে যেতে পারে—হয়তো বা সে শেষ পর্যন্ত ক্লোটেনকেই নিজের স্বামী বলে স্বীকার করে নেবে। মার কাছে এসব যুক্তির কথা শুনে ক্লোটেন অপেক্ষা করতেই রাজী হল।

দেশ ছেড়ে চলে যাবার পর পোস্‌থুমাস রোমে গিয়ে তার বাবার এক পুরানো বন্ধুর বাড়িতে আশ্রয় নিল। তিনি তাকে রোমের বড়ঘরের তরুণদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিয়ে দিলেন।

তরুণদের বৈঠকে নারীর প্রেম নিয়ে প্রায়ই আলোচনা হত। একদিন আয়াকিমো নামে এক তরুণ যুবক বলল যে সে ইচ্ছে করলে যে-কোন নারীর সঙ্গে প্রেম করে আসতে পারে। এ কথায় পোস্‌থুমাস আপত্তি করে বলল যে সব নারীর সঙ্গে প্রেম করা যায় না, বিশেষ করে তার বউ আইমোজেনের মত নারীর সঙ্গে। বাজি ধরে আয়াকিমো তখন বলল যে সে ব্রিটেনে গিয়ে পোস্‌থুমাসের বউ রাজকন্যা আইমোজেনের সঙ্গে প্রেম করে আসবে এবং প্রেম করার প্রমাণও নিয়ে এসে পোস্‌থুমাসকে দেখাবে। যদি সে এই প্রমাণ দেখাতে পারে, তবেই সে বাজি জিতবে, নইলে সে হারবে। আইমোজেনের উপর পোস্‌থুমাসের অগাধ বিশ্বাস, তাই সে আয়াকিমোর কথাটা হেসে উড়িয়ে দিয়ে বাজি ধরল।

সত্যিসত্যিই আয়াকিমো অল্প দিনের ভিতরই ব্রিটেনে এসে রাজা সিম্‌বেলিনের সঙ্গে দেখা করল। রাজা যদিও এখন রোমকে রাজকর দেন না, তবু রোমের একটা সম্মান তো আছে। রোমের বড়ঘরের ছেলে বলে সিম্‌বেলিনের সভায় আয়াকিমো যথেষ্ট খাতির পেল।

আইমোজেনকেও দেখতে পেল আয়াকিমো। প্রবাসী স্বামীর বন্ধু বলে আয়াকিমো খাতিরও পেল তার কাছে। তার সঙ্গে দু-চারটে কথা বলেই আয়াকিমো বুঝতে পারল যে হালকা প্রেমের কথা বললেই যেসব

নারীর মন পাওয়া যায়, আইমোজেন তাদের দলের নয়। অথচ সে বাজি না জিতে রোমে ফিরে গেলে তাকে সকলে উপহাস করবে।

অনেক ভেবে-চিন্তে আয়াকিমো ঠিক করল যে আইমোজেনকে ঠকিয়ে সে নিজের কাজ উদ্ধার করবে। তাই সে রোমে ফিরে যাবার আগের দিন আইমোজেনের সঙ্গে দেখা করে বলল যে রোমে ফিরে গিয়ে সম্রাটকে উপহার দিয়ে খুশী করবার জন্য সে এক বাক্স-ভরতি দামী দামী হীরে-মানিক কিনেছে—কিন্তু ওগুলো চুরি যাবার ভয়ে রাতে সরাইখানায় রাখতে তার ভরসা হচ্ছে না। এই বলে সে আইমোজেনকে তার ওই বাক্সটা সে-রাতের জন্য আইমোজেনের শোবার ঘরে রেখে দিতে অনুরোধ করল। সে আরও বলল যে পরদিন ভোরেই সে ওই বাক্সটা নিয়ে দেশে রওনা হবে।

স্বামীর বন্ধু বলে আয়াকিমোর জন্য আইমোজেনের অন্তরে দরদ দেখা দিল। আয়াকিমোর বাক্স সে নিজের শোবার ঘরে একরাত রেখে দিতে রাজী হল।

যথাসময়ে বাক্স এল আইমোজেনের শোবার ঘরে। সে তো বাক্স নয়, একটা বিশাল সিন্দুক।

গভীর রাতে আইমোজেন যখন বিছানায় ঘুমে অচেতন, সেই সময় সেই সিন্দুকের ডালাটি আপনা থেকেই খুলে গেল, আর তার ভেতর থেকে ধীরে ধীরে সাবধানে বেরিয়ে এল আয়াকিমো। সে তাকিয়ে তাকিয়ে সারা ঘরখানা ভাল করে দেখল, কী রকমের আসবাব, কী রঙের পরদা, কোন্ দিকে ঘরের দরজা, কোন্ দিকে জানালা, সব বারবার ঘুরে ফিরে দেখল, যাতে কোন কথা কিছুতেই ভুলে না যায়। তারপর সে অতি সাবধানে আইমোজেনের হাত থেকে খুলে নিল সেই কঙ্কণখানি, যা পোস্‌থুমাস ব্রিটেন ছেড়ে যাওয়ার দিনে উপহার দিয়ে গিয়েছিল আই-মোজেনকে। কাজ শেষ হলে ধীরে ধীরে আয়াকিমো ঢুকে পড়ল সিন্দুকে, আর ডালা আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে গেল।

খুব ভোরে আয়াকিমোর চাকররা এসে সিন্দুক বার করে নিয়ে গেল আইমোজেনের শোবার ঘর থেকে। তারপর একটু বেলায় আয়াকিমো নিজে এসে ধন্যবাদ দিয়ে গেল আইমোজেনকে। আইমোজেন তখন বুঝতেই পারল না যে স্বামীর ঐ বন্ধুটি তার কতখানি ক্ষতি করে চলে যাচ্ছে।

রোমে পৌঁছে সে পোস্‌থুমাসকে আইমোজেনের কঙ্কণখানি দেখিয়ে রসিয়ে রসিয়ে অনেক গালভরা মিথ্যা কথা বলল। বিদ্রূপ করে সে সকলের সামনে পোস্‌থুমাসকে হেয় করে বলতে লাগল যে সে পোস্‌থুমাসের বউ রাজকন্যা আইমোজেনের ঘরে রাত কাটিয়ে এসেছে! তারপর আয়াকিমো আইমোজেনের শোবার ঘরের কোথায় কী আসবাব আছে, কোন্ দিকে দরজা, কী রঙের পরদা তার জানালায় ও দেওয়ালে ঝোলে, এসব এমন নিখুঁতভাবে বর্ণনা দিয়ে বলে গেল যে পোস্‌থুমাস একেবারে হতবাক্ হয়ে গেল। তার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল যেন। তার মায়ের আশীর্বাদী অলংকার সেই কঙ্কণ আইমোজেন এই লম্পটকে দিয়েছে?

আগুন জ্বলে উঠল পোস্‌থুমাসের মাথায়। আইমোজেন যে অবিশ্বাসিনী, অসতী, তাতে আর কোন সন্দেহ রইল না পোস্‌থুমাসের। সে আইমোজেনকে ভয়ানক সাজা দেবার কথা ভাবতে লাগল।

* * *

এদিকে রোমের ঘরোয়া বিবাদ মিটে যাওয়ায় সিংহাসনে বসেছেন জুলিয়াস সীজারের ভাগিনেয় রোম সম্রাট অগস্টাস। সবদেশে রোমের শাসন পাকাপাকিভাবে চালু করার চেষ্টা করলেন তিনি। ব্রিটেন বহু বৎসর ধরে কোন রাজকর পাঠায়নি বলে তিনি গলদেশের রোমান সেনাপতি কাইয়াস লুসিয়াসকে তাঁর দূত হিসেবে ব্রিটেনে পাঠালেন। ফরাসীদেশের আগেকার নাম ছিল গল।

লুসিয়াস ব্রিটেনে এলে রাজা সিম্‌বেলিন তাঁকে খাতির করলেন বটে, কিন্তু রানী ও তাঁর ছেলে ক্লোটেনের পরামর্শে তিনি রোমকে কোন রাজকর দিতে রাজী হলেন না। লুসিয়াস তখন যুদ্ধের জন্য সিম্‌বেলিনকে তৈরী হতে বলে গলদেশে ফিরে গেলেন রোমান সৈন্য নিয়ে আসার জন্য।

ঠিক এই সময় রোম থেকে পোস্‌থুমাসের একখানি চিঠি এল ব্রিটেনে তাঁর বিশ্বাসী চাকর পিসানিওর নামে। সেই চিঠিতে পোস্‌থুমাস লিখেছে—"পিসানিও! আইমোজেন সতী নয়। আমি তাকে ওয়েল্‌সের জঙ্গলে এসে আমার সঙ্গে দেখা করতে লিখলাম। তুমি সঙ্গে করে তাকে ওখানে আনবে। আমি সত্যি সত্যি সেখানে যাচ্ছি না, তুমি ঐ জঙ্গলের ভিতর তাকে হত্যা করবে। তারপর হত্যার প্রমাণ হিসাবে তার রক্তমাখা কোন জামা বা কাপড় আমাকে পাঠাবে।"

ঐ চিঠির ভিতর আইমোজেনের নামেও এক টুকরো চিঠি ছিল।

তাতে লেখা আছে—"আমি ওয়েল্সের জঙ্গলে মিলফোর্ডের কাছাকাছি তোমার জন্য অপেক্ষা করব। তুমি অবশ্য এসে আমার সঙ্গে দেখা করবে।"

পোস্থুমাসের চিঠি পেয়ে পিসানিওর মাথায় যেন বাজ পড়ল একেবারে। আইমোজেন সতী নয়?—অসম্ভব কথা। পিসানিও দিনে রাতে সব সময় চোখে চোখে রেখেছে আইমোজেনকে। সে বুঝতে পারছে যে পোস্থুমাসের প্রতি তাঁর অনুরাগ আগের চেয়ে একতিলও কমেনি, বরং যতই দিন যাচ্ছে সে-অনুরাগ যেন আরও বেড়ে গেছে। তবে কী করে তিনি অবিশ্বাসিনী হলেন? আর বহুদূরে রোমে বসে পোস্থুমাসই বা কী করে জানলেন যে আইমোজেন অবিশ্বাসের কাজ করেছেন? পিসানিওর নিশ্চিত ধারণা হল যে তার মনিবের কোথাও না কোথাও ভুল হয়েছে, আর নিশ্চয়ই কোন অসৎ লোক নিজের কোন অসাধু মতলব হাসিল করবার জন্য ভুল বুঝিয়েছে পোস্থুমাসকে। তাই রাগে অন্ধ হয়ে মনিব যা-নয়-তাই ভেবেছেন তা নইলে আইমোজেনকে হত্যা করবার হুকুম তিনি কিছুতেই দিতে পারতেন না।

কিন্তু মনিবের হুকুম যখন এসেছে, তখন কিছু একটা করতেই হবে। সে মনে মনে এমন একটা মতলব ঠিক করল যাতে কাজও হাসিল হয়, অথচ আইমোজেনও নিরাপদ থাকে।

সে আইমোজেনকে লেখা পোস্থুমাসের চিঠিটা তাঁকে দিল, যাতে পোস্থুমাস আইমোজেনকে অনুরোধ করেছে মিলফোর্ডে এসে তার সঙ্গে দেখা করবার জন্য।

স্বামী দেশে ফিরে আসছেন শুনে আইমোজেন তো আনন্দে আপন-হারা! বহুদিন পরে স্বামীর দেখা পাবে এই আশায় সে অধীর হয়ে উঠল। পিসানিওকে সঙ্গে নিয়ে সে রাতের গভীরে প্রাসাদ ছেড়ে চলে গেল স্বামীর সঙ্গে দেখা করার জন্য।

মিলফোর্ডে পৌঁছে নিবিড় বনানীর ভিতর চলে এল দুজনে। জঙ্গলের ভিতর ঢুকবার পরেই আইমোজেন নজর করল যে পিসানিওর হাবভাব অন্য রকম হয়ে গেছে। সে যেন মুখ তুলে কথা কইতে পারছে না আইমোজেনের সাথে। ভয়ে লজ্জায় সে যেন ঘাড় হেঁট করে আছে। আইমোজেন এর কারণ জিজ্ঞাসা করল।

পিসানিও তাঁকে দেখাল পোস্‌থুমাসের সেই চিঠি—যাতে তিনি পিসানিওকে লিখেছেন, অবিশ্বাসিনী আইমোজেনকে হত্যা করতে।

আইমোজেনের পায়ের নীচে পৃথিবী দুলে উঠল যেন! অবিশ্বাসিনী সে! স্বামীর নাম যে ভগবানের নামের মত জপ করে, শয়নে স্বপনে স্বামীর চিন্তা ভিন্ন অন্য চিন্তা যার নেই, স্বামীকে দেখতে না পাওয়ার দুঃখে রোজ রাতে চোখে যার ঘুম নেই, সারারাত জেগে কেঁদে কেঁদে মাথার বালিশ যে চোখের জলে ভিজিয়ে ফেলে, সে হল বিশ্বাসঘাতিনী? দুঃখে, ধিক্কারে আইমোজেন পিসানিওকে বলল, "স্বামী যখন আমাকে এইরূপ মনে করেন, তখন মৃত্যুই আমার ভাল। তুমি হত্যা কর আমাকে; তোমার মনিবের হুকুম তামিল কর।"

পিসানিও বলল, "আমার মনিব যে একটা ভয়ানক ভুল করেছেন—তাতে আমার সন্দেহ নেই। সেই যে রোম থেকে আয়াকিমো নামে একটা লোক এসেছিল, আমার মনে হয় সে-ই এখান থেকে ফিরে গিয়ে ঝুড়ি-ঝুড়ি মিথ্যা কথা বলে আমার মনিবের মনকে মিথ্যা সন্দেহে বিষিয়ে দিয়েছে। কিন্তু মিথ্যা একদিন ধরা পড়বেই; কবে সত্য প্রকাশ পাবে, সেই সুদিনের আশায় ধৈর্য ধরে চুপ করে থাকা উচিত। আপনি যদি পুরুষের বেশে রোমে চলে যান, তাহলে সেখানে আপনার স্বামীর অজান্তে আশেপাশে থেকে তাঁর গতিবিধি নজর করতে পারবেন এবং সুযোগ পেলে তাঁর ভুল ভেঙে দিয়ে তাঁর সঙ্গে আবার মিলিত হতে পারবেন।"

এ-পরামর্শ আইমোজেনের পছন্দ হল। কিন্তু পুরুষের বেশ সে পাবে কোথায়?

এ অসুবিধা দেখা দেবে, তা পিসানিও জানত, তাই পুরুষের পুরো এক প্রস্থ পোশাক সে সঙ্গে এনেছে। আইমোজেনকে সেই সাজে সাজিয়ে দিয়ে সে বিদায় দিল। মিলফোর্ডে গিয়ে আইমোজেন এখন জাহাজ ধরবে রোমের জন্য। পিসানিও ফিরবে রাজধানীতে।

বিদায়কালে সে একটা ওষুধ দিল আইমোজেনকে। এই ওষুধটা রানী কর্নেলিয়াসের কাছ থেকে যোগাড় করে এনে পিসানিওকে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন—"আইমোজেন যদি কখনো অসুস্থ হয়, এই ওষুধ তাকে খাইয়ে দিও, সকল রকম অসুখ এতে সেরে যায়।"

রানী কিন্তু ঠকিয়েছিলেন পিসানিওকে। তিনি জানতেন ওটা বিষ,

খেলেই আইমোজেন মারা যাবে, আর ক্লোটেনের রাজসিংহাসনের কাঁটা দূর হবে।

নিবিড় বনের ভিতর বিদায় নিল দুজনে। মিলফোর্ড বন্দরে পৌঁছোবার বনপথ সে আইমোজেনকে দেখিয়ে দিয়ে গেল। সেই পথেই এগিয়ে গেল পুরুষবেশী আইমোজেন।

কিন্তু পথ হারিয়ে ফেলল আইমোজেন। ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে পড়ল মিলফোর্ডের অনেক দূরে নিবিড় জঙ্গলে। সঙ্গে সামান্য যে খাবার ছিল, তা ফুরিয়ে গেছে, খাওয়া হয়নি অনেকক্ষণ। এখন কিছু খাবার না পেলে আর সে এক পা-ও চলতে পারছে না।

পাহাড়ের গায়ে একটি গুহা দেখতে পেয়ে আইমোজেন সেখানে গেল। দেখল—গুহায় মানুষের বসবাসের চিহ্ন আছে, কিন্তু মানুষ কেউ নেই; তবে খাবার সেখানে আছে। খিদে-তেষ্টায় এতই কাতর হয়েছিল আইমোজেন যে গুহার মালিক ফিরে আসা পর্যন্ত সে আর অপেক্ষা করতে পারল না। হাতের কাছে যা খাবার পেল তাই সে খেয়ে ফেলল।

একটু পরেই ফিরে এল গুহার অধিবাসীরা—এক বুড়ো, আর দুই ছেলে, নবীন যুবা। আইমোজেন নিজের নাম বলল ফাইডেল। তাদের না বলে তাদের খাবার খেয়ে ফেলেছে বলে সে ক্ষমা চাইল, দিতে চাইল তাদের খাবারের দাম।

তারা তো একথা শুনে অবাক্! খাবারের আবার দাম? তারা নিজের হাতে বনের হরিণ মেরে খায়, দাম দিয়ে কেনে না। ফাইডেলের আরও যদি খেতে ইচ্ছে হয়, আরও খাক। তাতে ওরা আনন্দই পাবে। সুকুমার বালকের বেশে আইমোজেনকে এত সুন্দর দেখাচ্ছিল, আর তার কথাবার্তা ছিল এত ভদ্র ও মধুর যে তাকে দেখেই যুবক দুটির হৃদয় তার প্রতি স্নেহে গলে গেল একেবারে। তারা কি আর তখন জানে যে তাদের একমাত্র বোন অজানা অচেনা বালক সেজে তাদের অজান্তে তাদের কাছে এসেছে বলে প্রকৃতিই তাদের অন্তরে এমনভাবে স্নেহের সঞ্চার করছে।

এই যুবক দুটি হল গিডেরিয়াস ও আরভিরেগাস—সিম্‌বেলিনের দুই হারানো ছেলে। এরা আইমোজেনের সহোদর ভাই।

আর ওই বুড়ো? বনচর শিকারীর বেশধারী ওই বুড়োই আগের দিনের বিখ্যাত যোদ্ধা বেলারিয়াস। এখন ওঁর নাম শিকারী মর্গান।

এই সময়ে আইমোজেন একটু অসুস্থ বোধ করতে লাগল। বনে বনে ঘুরে তার দেহটি বেশ ভাল নেই। সে-কথা শুনে গুহাবাসীরা তাকে গুহাতেই বিশ্রাম করতে বলে নিজেরা শিকারে বেরিয়ে গেল।

এদিকে আইমোজেনের মনে পড়ে গেল—তার কাছে তো ওষুধ আছে। পিসানিও বলেছে যে যে-কোন রকম অসুখ এই ওষুধে সারবে। মনে পড়তেই সে সেই ওষুধ খেয়ে ফেলল।

আর সঙ্গে সঙ্গে তার দেহে প্রকাশ পেল মৃত্যুর লক্ষণ। আরভিরেগাস ও গিডেরিয়াস যখন শিকার করে গুহায় ফিরে এল, তখন জীবনের কোন চিহ্নই নেই আইমোজেনের দেহে। আপনার জন মারা গেলে লোকে যেমন দুঃখ পায়, ঠিক সেইরকম দুঃখই তারা পেল, এবং কান্নাকাটি করতে লাগল করুণভাবে।

* * *

আইমোজেন পালিয়েছে শুনেই ক্লোটেন যেন ক্ষেপে উঠল একেবারে। মরিয়া হয়ে আইমোজেনকে খুঁজে বেড়াতে লাগল চারধারে। আইমোজেনকে পেল না, কিন্তু পেল তার ভৃত্য পিসানিওকে।

পিসানিওকে সে জিজ্ঞাসা করল, "আইমোজেন কোথায় ?"

পিসানিওর ধারণা যে আইমোজেন এতক্ষণ মিলফোর্ড বন্দরে জাহাজে চড়ে রোমের পথে রওনা হয়েছেন। সুতরাং সে নির্ভয়ে বলল, "রাজকন্যা মিলফোর্ডে গেছেন।"

"কেন ?—জিজ্ঞাসা করল ক্লোটেন।

"তাঁর স্বামী সেখানে এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন বলে।"—উত্তর দিল পিসানিও।

ক্লোটেন তখন বলল, "পোস্থুমাসের একটা পোশাক আমাকে এনে দাও। তাই পরে আমি সেখানে যাব। দূর থেকে সেই পোশাকে আমাকে দেখলে আইমোজেন নিজে এসে আমার কাছে হাজির হবে।"

পিসানিও জানে যে, আইমোজেন এতক্ষণ জাহাজে চড়ে বসেছেন। কাজেই কোন আপত্তি না করে সে মনিবের একটা পোশাক এনে ক্লোটেনকে দিল। সেই পোশাক পরে তখনি ক্লোটেন রওনা হয়ে গেল মিলফোর্ডের দিকে।

খুব তাড়াতাড়ি সে ওয়েল্‌সের জঙ্গলে পৌঁছে গেল।

সেখানে পোস্থুমাসকে সে দেখতে পেল না, আইমোজেনকেও দেখতে

পেল না, দেখতে পেল আরভিরেগাস আর গিডেরিয়াসকে এবং তাদের বুড়ো অভিভাবক বেলারিয়াসকে।

চিরদিনই ক্লোটেন অহংকারী, অভদ্র লোক। বনচর শিকারী মনে করে সে এমনভাবে ওদের সঙ্গে কথা কইতে লাগল—যেন সে তার চাকরদের সঙ্গে আলাপ করছে। এতে রেগে প্রতিবাদ করল ওই দুজন যুবক। তার ফলে আরও রেগে গিয়ে চেঁচিয়ে বলে উঠল ক্লোটেন—"জানিস্, আমি রানীর ছেলে ?"

রানীর ছেলে ? তবে কি ওই লোকটা রাজার হুকুমে এই বনে এসেছে ? তবে কি বেলারিয়াসের গোপন কথা প্রকাশ হয়ে পড়েছে ? ক্লোটেনের সঙ্গে রাজার সৈন্যরা এসেছে কিনা তা দেখবার জন্য বেলারিয়াস তাড়াতাড়ি পাহাড়ের উপরে উঠলেন। তাঁকে একা যেতে দেবে না বলে আরভিরেগাসও সঙ্গী হল তাঁর।

গিডেরিয়াসের সঙ্গে ঝগড়া আরও ঘোরালো হয়ে উঠল ক্লোটেনের অবশেষে শুরু হল লড়াই, এবং সেই লড়াইয়ে ক্লোটেন মারা গেল। তার কাটা মাথাটা গিডেরিয়াস ছুঁড়ে ফেলে দিল নিকটের এক নদীর জলে। তারপর সে খুঁজতে বেরুল বাপভাইকে।

এতক্ষণ আইমোজেন মরার মত পড়েছিল সেই গুহায়। রানী বিষ বলে যে জিনিসটা কর্নেলিয়াসের কাছ থেকে পেয়েছিলেন, তা প্রাণঘাতী বিষ নয়, সেটা এমন বিষ যা খেলে কিছুক্ষণ মানুষ মড়ার মত পড়ে থাকবে, আবার ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠবে। তাই আইমোজেনের জ্ঞান ফিরে আসতে লাগল।

আইমোজেন বেঁচে উঠে গুহা থেকে বাইরে বেরিয়ে এল। এসেই দেখল চারদিকে রক্তে থইথই করছে আর সেই রক্তের ভিতর পড়ে আছে একটা মুণ্ডহীন মৃতদেহ এবং সেই মৃতদেহের পরনে যে পোশাক রয়েছে, তা তার স্বামী পোস্‌থুমাসের।

অভাগিনী আইমোজেনের ধারণা হল—ওই মৃতদেহ তারই স্বামী পোস্‌থুমাসের। নিশ্চয়ই পোস্‌থুমাস তার সঙ্গে দেখা করতে এই জঙ্গলে এসেছেন, এবং কোন গুপ্ত শত্রুর হাতে নিহত হয়েছেন। সেই মুণ্ডহীন দেহের উপর পড়ে সে কাতর হয়ে চেঁচিয়ে কাঁদতে লাগল।

সে কান্না শুনতে পেলেন রোমান সেনাপতি লুসিয়াস। তিনি সৈন্য

নিয়ে গল থেকে ব্রিটেনে এসেছেন। তিনি চলে এলেন আইমোজেনের কান্নার স্বর লক্ষ্য করে।

সৈন্যদল দেখে বেলারিয়াস ও ছেলে দুজন তখন লুকিয়ে পড়েছেন, কারণ এরা সিম্‌বেলিনের সৈন্য, না রোমের সৈন্য, তা দূর থেকে তাঁরা বুঝবেন কেমন করে? কাজেই লুসিয়াস এসে পুরুষবেশী আইমোজেন ছাড়া আর কাউকে সেখানে দেখতে পেলেন না।

তাঁর প্রশ্নের উত্তরে আইমোজেন বলল—তার নাম ফাইডেল; সে ঐ নিহত লোকটির চাকর। তার মনিব এই বনের ভিতর ডাকাতের হাতে নিহত হয়েছেন।

মনিবের জন্য কোন চাকর এরকম বিলাপ করে কখনো? লুসিয়াস মুগ্ধ হলেন মনিবের উপর ফাইডেলের ভক্তি দেখে। তাকে তিনি নিজের চাকর হিসাবে সঙ্গে নিতে চাইলেন। তারপর মৃতদেহটি কবর দেওয়া হল ফাইডেলের অনুরোধে। আইমোজেন চলল লুসিয়াসের সঙ্গে, একা সেই জঙ্গলের ভিতর সে আর করবে কী? রোমে যাওয়ার দরকার তো তার ফুরিয়েছে। স্বামী তো আর বেঁচে নেই তার।

ব্রিটেন ও রোমের মধ্যে যুদ্ধ বেধে গেল। সিম্‌বেলিন সৈন্য সাজালেন। ক্লোটেনের বাহুবলের উপর রাজার ভরসা ছিল। এখন বিপদের সময় সে এভাবে হঠাৎ উবে গেল দেখে তিনি বড়ই মুষড়ে পড়লেন।

কিন্তু ক্লোটেনের অভাব পূরণ করল তাঁর নিজেরই দুই ছেলে। তারা যে রাজারই ছেলে, একথা না জেনেও তারা এসে রাজার সৈন্যদলে যোগ দিল সামান্য সৈনিকের বেশে। বেলারিয়াসই তাদের নিয়ে এলেন, কারণ জন্মভূমির উপর যখন শত্রুর আক্রমণ হয়েছে, তখন প্রত্যেক সৈনিকেরই প্রথম কর্তব্য হল স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যুদ্ধে যোগ দেওয়া। এসময়ে নিজের ক্ষয়ক্ষতির কথা ভাবা উচিত নয়।

ওদিকে লুসিয়াসের সঙ্গে ব্রিটেনের বিরুদ্ধে যারা যুদ্ধ করতে এসেছে, তাদের মধ্যে আয়াকিমো এবং পোস্‌থুমাসও আছেন।

কিন্তু পোস্‌থুমাস আর সেই পোস্‌থুমাস নেই। আইমোজেনকে পিসানিও হত্যা করেছে, সে-খবর সে পেয়েছে। পেয়ে অবধি মন তার অনুতাপের আগুনে জ্বলে যাচ্ছে। আইমোজেনকে হত্যা করে সে যে ঘোরতর অন্যায় করেছে, তা সে এতদিনে বুঝতে পেরেছে।

পোস্‌থুমাস ঠিক করল, সে যুদ্ধে মরবে এবং রোমের সৈন্যদের বিরুদ্ধে

লড়াই করবে দেশের পতাকার নীচে দাঁড়িয়ে। পোস্‌থুমাস গোপনে রোমান শিবির ছেড়ে এবং গরীব চাষার বেশ ধরে ব্রিটনশিবিরে হাজির হল যুদ্ধে যোগ দেবার জন্য।

যুদ্ধ শুরু হল। কিছুক্ষণ যুদ্ধের পরই সিম্‌বেলিন বন্দী হলেন। কিন্তু সেই সময় সিম্‌বেলিনকে শত্রুদের কবল থেকে মুক্ত করল চারজন সৈনিক—বেলারিয়াস, আরভিরেগাস, গিডেরিয়াস আর চাষার পোশাকে পোস্‌থুমাস।

ঐ চারজন সৈনিকের বীরত্ব দেখে যুদ্ধের হাওয়াও গেল ঘুরে। শেষ পর্যন্ত রোমানদের পরাজয় হল, লুসিয়াস বন্দী হলেন, তাঁর সঙ্গে বন্দী হল আয়াকিমো ও ফাইডেল।

মহৎ লুসিয়াস! তিনি নিজের প্রাণ ভিক্ষা না চেয়ে তাঁর চাকর ফাইডেলের প্রাণ ভিক্ষা চাইলেন। ফলে সিম্‌বেলিনের নজর পড়ল ফাইডেলের উপর। আইমোজেনের সঙ্গে ওর মুখের চেহারার মিল লক্ষ্য করে ওর উপর রাজার কেমন স্নেহ পড়ে গেল। তিনি ওর প্রাণভিক্ষা তো দিলেনই, তাছাড়াও ওকে বললেন, "তোমার যদি কোন প্রার্থনা থাকে, আমি নিশ্চয়ই তা পূরণ করব।"

ফাইডেল বলল, "ওই রোমান যুবককে আমার কিছু জিজ্ঞাসা করবার আছে। আপনি ওকে আদেশ করুন—পোস্‌থুমাস লিওনেটাসের ব্যাপার ও যা জানে সমস্ত খুলে বলুক। সত্য কথা না বললে ওকে জ্বালা-যন্ত্রণা দিয়ে ওর মুখ থেকে সত্য কথা বার করে নিন।"

ফাইডেলের লক্ষ্য বন্দী আয়াকিমো।

যন্ত্রণার ভয়ে আয়াকিমো সব কথা প্রকাশ করে বলল।

তার মুখে সব কথা শুনে পোস্‌থুমাস ক্ষোভে দুঃখে অনুতাপে এমন বিচলিত হয়ে পড়ল যে নিজের পরিচয় সে আর গোপন রাখতে পারল না। আইমোজেনের নাম করে সে হাহাকার করতে লাগল নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়ে।

এই চাষার ছেলেই যে পোস্‌থুমাস, একথা জেনে খুশী হলেন রাজা। নিজের মুক্তির জন্য এবং যুদ্ধজয়ের জন্য এর বীরত্বের কাছে তিনি অনেকখানি ঋণী। কিন্তু একে পুরস্কার দিতে হলে আইমোজেনকে এর হাতে তুলে দেওয়া দরকার। কোথায় আজ সেই আইমোজেন!

এদিকে এই চাষার ছেলেই যে তার স্বামী পোস্‌থুমাস—একথা জানতে

পেরে আইমোজেন যেন পাগল হয়ে উঠল বিস্ময়ে আর আনন্দে। কিন্তু সে না নিজের চোখে স্বামীর মৃতদেহ দেখেছিল ওয়েল্সের জঙ্গলে? সে তবে কার মৃতদেহ? সে খোলাখুলি নিজের মনের সন্দেহ প্রকাশ করে বলল, "সে তবে কার মৃতদেহ?"

"রানীর ছেলের"—উত্তর দিল গিডেরিয়াস, যে বধ করেছিল ক্লোটেন কে।

"রানীর ছেলেকে বধ? ক্লোটেনকে?"—রাজা রেগে উঠলেন। হোক্ এরা তাঁর উপকারী, মুক্তিদাতা, তবু ক্লোটেনের হত্যাকারীকে ক্ষমা তিনি করতে পারেন না। ক্লোটেন তো তাঁরই রানীর ছেলে!

"রানীর ছেলের হত্যাকারী যদি আপনার নিজের ছেলে হয়, তবুও কি ক্ষমা করতে পারবেন না?"—তীক্ষ্নস্বরে প্রশ্ন করলেন বেলারিয়াস।

"ছেলে? আমার ছেলে?"—বিস্ময়ে হতবাক্ রাজা!

বেলারিয়াস তখন নিজের পরিচয় দিলেন, পরিচয় দিলেন আরভিরেগাস ও গিডেরিয়াসের। রাজা আনন্দে অধীর! যাদের ফিরে পাওয়ার আশা বহুদিন আগেই তিনি ছেড়ে দিয়েছেন, সেই হারানো ছেলেদের এতদিন পরে ফিরে পেলেন আবার? আনন্দে আবেগে তিনি বেলারিয়াসকে ক্ষমা করে তাঁকে আলিঙ্গন করলেন—তাঁর বাজেয়াপ্ত ভূসম্পত্তি ফিরিয়ে দেবার হুকুম দিলেন তখুনি।

আর, পোস্থুমাসকে কাছে টেনে এনে রাজা আইমোজেনকে তার হাতে তুলে দিলেন। পরিহাস করে মেয়েকে বললেন, তোমার ভাইয়েরা ফিরে এসেছে, তুমি আর রাজ্য পাবে না।"

আইমোজেন রাজ্যের লোভ করে না। সে উত্তর দিল, "একটা রাজ্যের বদলে আমি তুটো সাম্রাজ্য পেয়েছি। তুই ভাইয়ের স্নেহের সাম্রাজ্য। আর সে স্নেহ আমি আজ পাইনি, ফাউডেল বেশে যেদিন ভাইদের গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলাম, সেদিনই তা পেয়েছিলাম।"

এই আনন্দের দিনে শত্রুকেও আর বন্দী করে রাখতে মন চায় না। লুসিয়াস ও অন্য রোমান বন্দীদের মুক্ত করে দিলেন রাজা। লুসিয়াসের সালিশীতে রোমের সঙ্গে ব্রিটেনের সন্ধিও হল।

পরিপূর্ণ আনন্দের মধ্যে একটা তুঃসংবাদ রাজার কানে এল—রানী হঠাৎ প্রাণত্যাগ করেছেন। রাজা নিজের মনকে এই বলে সান্ত্বনা দিলেন—"এ ভালই হল।"

সমাপ্ত